

Volume-III, Issue-II, December 2021



ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal



Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN

ISSN 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -III, Issue-II, December 2021



Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Dr. Khandakar Hamidul Islam	Head, Department of Islamic History & Culture
Professor Dr. Khandakar Ahsanul Kabir	Head, Department of Physics
Dr. Md. Mizanur Rahman	Head, Associate Professor, Department of Social Work
Dr. Hosne Ara	Associate Professor, Department of Zoology
Shankar Kumar Mallick	Associate Professor, Department of Bangla
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque	Associate Professor, Department of Bangla
	Goenka College of Commerce & Business
	Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty	Assistant Professor, Department of Bangla
	Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain	Assistant Professor, Department of Mathematics



Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh

Phone : 0088-02477702944 email : infoblcollege@gmail.com

Website : www.blcollege.edu.bd

Printed by

Rabi Printing Press

27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)



Contents

বাংলা অংশ

- ◆ বাংলা কীর্তন, বাঙালি সংস্কৃতির এক অনন্য ধারা
ড. সুদেষ্ণা বণিক 07-15
- ◆ সমান্তরাল যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যের
অধ্যাত্ম জীবনযাপন ও সাধনার বিশ্লেষণ
সৌরভ দাস 16-23
- ◆ মৌসলপর্বের ধ্বংসলীলার উপাখ্যান
আধুনিক কবির মননে চিত্তনে
বীণা মজল 24-31
- ◆ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক
যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব
লাবন্য কুমার সরকার 32-46
- ◆ বর্গি হাসামার প্রেক্ষিতে ‘মহারাত্রিপুরাণ’
ও ‘আধারমানিক’: প্রসঙ্গ এক্সোডাস
সুমন সাহা 47-53

English Section

- ◆ Parallelism Between Uniform
and Normal Percentiles
Anwar H. Joarder 57-64
- ◆ Portrayal of Submission and Defiance of Women
in Literature by South Asian Women Writers
K.P.S. Subhani 65-73
- ◆ Male ‘I’ and the Trope of Failure in Shashi
Deshpande’s *The Dark that Holds No Terrors*
Dr. Sabreen Ahmed 74-84
- ◆ Case Study Review and Modeling of In-house
Training for Enhancing Professional
Intelligence of College Teachers
Mahadi Hasan Bappy & Dr. Shamsiah Banu Mohamad Hanefar 85-99
- ◆ Mental Health Status in Relation to Adjustment
during COVID- 19
Dr. Abu Syed Md Azizul Islam 100-110
- ◆ Socio-political Mobilisation of Madrassas
and Muslims in Colonial Surma-Barak Valley
Dr. Mahbubur Rahman Laskar 111-123



**Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh**

BL College Journal



ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

Volume -III Issue-II

December 2021

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

**A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College
December 2021**

**Published by
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**



Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

বাংলা অংশ

Contents



**Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh**

BL College Journal

ISSN

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

Volume -III Issue-II

December 2021

- ◆ বাংলা কীর্তন, বাঙালি সংস্কৃতির এক অনন্য ধারা
ড. সুদেষ্ণা বণিক 07-15
- ◆ সমান্তরাল যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যের
অধ্যাত্ম জীবনযাপন ও সাধনার বিশ্লেষণ
সৌরভ দাস 16-23
- ◆ মৌসলপর্বের ধ্বংসলীলার উপাখ্যান
আধুনিক কবির মননে চিস্তনে
বীণা মজল 24-31
- ◆ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক
যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব
লাবন্য কুমার সরকার 32-46
- ◆ বর্গি হাঙ্গামার প্রেক্ষিতে ‘মহারত্নপুরাণ’
ও ‘আঁধারমানিক’: প্রসঙ্গ এক্সোডাস
সুমন সাহা 47-53



Volume -III, Issue-II, December 2021

বাংলা কীর্তন, বাঙালি সংস্কৃতির এক অনন্য ধারা

ড. সুদেষ্ণা বণিক

সারসংক্ষেপ

ড. সুদেষ্ণা বণিক
পিএইচডি (কণ্ঠসঙ্গীত, কীর্তন)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: baniksudeshnaa@gmail.com

ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে যে সংগীত, কীর্তন তার অন্যতম অঙ্গ। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীত কাল থেকে ধর্মীয় উপাসনার প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো এই সংগীত। কালে কালে এই সংগীত মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত হয়- ১) অভিজাত নাগরিক সংগীত ও ২) গ্রামীণ লোকসংগীত। আর বাংলার নিজস্ব অভিজাত সংগীত হল কীর্তন।।

এইজন্যই সংগীতের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের তাগিদে কীর্তন গানের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান জরুরি। কীর্তনের উৎস তথা উৎপত্তি বিষয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। বর্তমানে কীর্তনকে লোকসংগীতের আওতাভুক্ত করা হলেও সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মূলত অভিজাত দেশী সংগীত থেকেই কীর্তনের উৎপত্তি হয়েছে।

যুগে যুগে বাংলার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কীর্তনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সর্বপ্রথম সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে কীর্তনের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই পথের পথিক হন শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত খেতরি মহোৎসব আয়োজিত হয় যেখানে কীর্তনের ‘নিবন্ধ গীতরূপ’-এর প্রচলন এবং গরানহাটি চালের কীর্তনের প্রবর্তন ঘটে। সেদিনের সেই মহোৎসব থেকেই কীর্তন গান ‘অভিজাত নিবন্ধ সংগীত’-এর মর্যাদা লাভ করে। কালক্রমে এই ধারার অনুসরণে সৃষ্টি হয় আরও চার প্রকার চাল বা রীতির কীর্তন- মনোহরশাহী, রেনেটি, মন্দারিনী ও ঝাড়ুখণ্ডী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ‘কবি গান’ ও ‘পাঁচালি গান’-এর প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে কীর্তন গান তার অভিজাত্য হারাতে বসেছিল তখন সামগ্রিকভাবে কীর্তনকে বাঁচাতে, মানবসমাজে তার লোকপ্রিয়তা ফিরিয়ে দিতে সৃষ্টি হয়েছিল ‘ঢপ কীর্তন’-এর। এই ঢপ কীর্তনের দ্বারা বাংলা কীর্তন

গানের হতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং সর্বসাধারণে এই ঢপকে প্রবল জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে মধুসূদন কিল্লর বা মধু কান নামক গায়কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মূলত মধু কানের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টাতেই বাংলা কীর্তনের হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরে আসতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা সর্বসাধারণে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা কীর্তন প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় প্রবন্ধ গানের উত্তরসূরী যেখানে দেশজ লোক-সুরের ছোঁয়াও রয়েছে। এই কারণেই এই শৈলী যেমন গ্রামীণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল, তেমনই অভিজাত নাগরিক সমাজের কাছেও ছিল আদৃত। তাই বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানের বিখ্যাত স্রষ্টারা (পঞ্চকবি সহ) নানানভাবে তাঁদের গানে কীর্তনের প্রয়োগ করে নিজেদের সৃষ্টিকে করেছেন মহিমান্বিত, ভারতীয় সংগীত-জগৎকে করেছেন ঐতিহ্যমণ্ডিত।

মূলশব্দ

কীর্তন, পদ, প্রবন্ধ, পদাবলী

ভূমিকা

বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ হচ্ছে ‘কীর্তন’। একে বাংলার ‘নিজস্ব অভিজাত সংগীত’ও বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে আমরা ‘অভিজাত সংগীত’ বলতে যে উচ্চাঙ্গ সংগীতকে বুঝি, তা প্রকৃতপক্ষে বহির্বঙ্গের সংস্কৃতি। মূলত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত বৈশিষ্ট্যকেই আমরা ‘অভিজাত উচ্চাঙ্গ সংগীতের’ গোত্রভুক্ত করে থাকি। অবশ্য, সঠিক বৈশিষ্ট্য বিচারে এইধরনের সংগীত শুধুমাত্র বহিরাগত সংগীত হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু বাঙালির প্রকৃত পছন্দ, আবেগ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে নিঃসন্দেহে কীর্তন গানকেই সেই মর্যাদা দিতে হবে।

বিশিষ্ট ভারতীয় সংগীত-গবেষক ড. বিমল রায়, শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, ড. কৈলাশ চন্দ্র বৃহস্পতি, ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ প্রমুখ নানান যুক্তি প্রমাণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত গান, অভিজাত বা নাগরিক এবং লোক সংগীত বা

উপজাতীয় সংগীত সৃষ্টি হয়েছে আদিম গান থেকে। পরবর্তীকালে এই আদিম গানের পরিবর্তিত তথা বিবর্তিত রূপ থেকে জন্ম হয় ভারতবর্ষের বৈদিক ও লৌকিক সংগীতের। তবে খ্রিস্টের জন্মের নিকটবর্তী সময়ে ভারতীয় সমাজে বৈদিক সংগীত তথা বৈদিক সামগানের প্রভাব দ্রুতগতিতে হ্রাস পেয়ে সেই স্থানে ধীরে ধীরে লৌকিক তথা সাধারণ লোকজ সংগীতের প্রভাব বাড়তে থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে লৌকিক গানেরও দু’টি ধারা প্রচলিত ছিল- গান্ধর্ব লৌকিক বা মার্গ সংগীত এবং দেশি বা আঞ্চলিক সংগীত। গান্ধর্ব লৌকিক তথা মার্গ সংগীত কঠোর নিয়মের অধীন ছিল বলে তা অনেকটা অনড় সংস্কৃতিতে পরিণত হয় এবং সমাজ-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুযায়ীই খ্রিস্টোত্তর সময়ে ক্রমে বিলুপ্ত হয়। অপরদিকে আঞ্চলিক বা দেশি সংগীতে দেশ তথা অঞ্চল এবং পরম্পরা ভেদে বিবর্তনের গতি সচল থাকে বলে তা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তবে বৌদ্ধ যুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি প্রদান করে গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের কিছু সংগীত বিধির

সমন্বয়ে এক প্রকার নাগরিক সংগীতের সৃষ্টি করা হয় যাকে ‘অভিজাত দেশি সংগীত’ নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রগুলিতে এই নতুন সংগীতকে শুধুই ‘দেশি সংগীত’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর, শাস্ত্র-বহির্ভূত দেশি সংগীত, অর্থাৎ উপজাতীয় গান বা লোক সংগীত চিরকালই শাস্ত্র গ্রন্থের বাইরে অবস্থান করেছে। আর এই অভিজাত দেশি সংগীত থেকেই কালক্রমে ‘কীর্তন তথা বাংলা কীর্তন’-এর উৎপত্তি বলে ধারণা করা যায়।

পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধে মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও অন্যান্য গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

মূলত সংস্কৃত শব্দ ‘কীর্তন’-এর ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হল- ‘কী ধাতু + ‘লুট’ প্রত্যয়। ‘কীর্ত’ ধাতু অর্থে বোঝায় বর্ণনা বা প্রশংসা তথা যশ বা কীর্তি কখন। অতএব কীর্তন অর্থে বিশেষ ব্যক্তি, ভূস্বামী তথা রাজা বা দেব-দেবীর গুণাবলি, কার্যাবলি বা কৃতিত্ব বর্ণনা বোঝায়। সাধারণত পদ্যের আকারে বর্ণিত কীর্তনই ‘পদ’ নামে আখ্যায়িত হয়।

প্রাচীনকালে পদকে দুটি প্রকারে ব্যবহার করা হতো। এগুলি হল- ১) কাব্যপদ (Verse) ও ২)। গায়পদ (Lyric)। রচয়িতা যখন স্বরচিত পদ নিজেই নাট্যভঙ্গিসহ পাঠ বা আবৃত্তি করতেন, সেই পদকে বলা হত কাব্যপদ। আর যে পদসমূহ রচয়িতা সুর ও তাল সহযোগে গাইতেন, সেগুলিই ছিল গায়পদ। প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রগুলিতে এই গায়পদ রচয়িতাদের একাধারে গীতিকার ও সুরকার, অর্থাৎ বাগ-গেয়-কার’ বলা হয়েছে। আদি কবি জয়দেব গোস্বামী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত,

অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রমুখ এবং পরবর্তীকালে সলিল চৌধুরী ও আরও অনেকেই এই প্রাচীন রীতির ধারক ও বাহক ছিলেন। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাগণও এই ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজেরাই পদ রচনা করে তাতে সুরারোপ করে গাইতেন, এই ধরনের গানই ‘পদগান’ নামে পরিচিত ছিল। তখন বর্তমানের ন্যায় বাংলা ‘কীর্তন’ অথবা কর্ণাটক ‘কীর্তন’-এর মতো কোনো নির্দিষ্ট শৈলীর গান ছিল না। কারণ সেইসময় কোনো সুনির্দিষ্ট গীতশৈলীর প্রচলন ছিল না। তখন যা ছিল তাকে বলা হত গায়পদ তথা ‘প্রবন্ধ (পদগান), যাকে আমরা বর্তমানে কম্পোজিশন বলে থাকি। এই পদগান বা প্রবন্ধের দুই রকম প্রয়োগ স্বীকৃত ছিল ১) নাট্যাশ্রিত, যা ছিল নাটকের আকারে কাহিনীভিত্তিক পদাবলী গান, ২) পদগান, যা ছিল নাট্য বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অর্থাৎ কোনো কাহিনীর অংশ নিয়ে একটিমাত্র পদ সম্বলিত গান।

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে গায়পদকেই প্রবন্ধ বলা হত এবং সাধারণ পদগান ও প্রবন্ধের মাঝে সামান্য পার্থক্য ছিল। সাধারণত পদগানের সুর দেশজ লোকসুর হত, কিন্তু বিশেষ পদগান তথা প্রবন্ধতে দেশজ রাগ বা দেশি রাগ ব্যবহৃত হত। যে সংগীত গ্রামে জন্মায় তাঁকে বলা হয় গ্রাম্যগীত বা লোকগীত। কিন্তু প্রবন্ধ রাগাশ্রিত গান বলেই তা কখনও লোকগীত হতে পারে না। তাই এটি অভিজাত সংগীতের পর্যায়াভুক্ত, নাগরিক সংগীত। তবে প্রাচীনকাল থেকেই প্রবন্ধ এবং লোকগীতের মধ্যবর্তী যে প্রকীর্ত গান’ ছিল তাতে রাগ-নিয়মের বন্ধন ছিল কিছুটা শিথিল। রাগসংগীত ও লোক-সংগীতের মাঝামাঝি এই অবস্থাকে সংগীতশাস্ত্রজ্ঞগণ উপ-রাগসংগীত বা ক্লাসিকো-ফোক-সঙ বলে উল্লেখ করে থাকেন। বাংলা কীর্তনের সুরকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এই প্রকীর্ত শ্রেণির গানকেই এর উৎস হিসেবে চিহ্নিত

করা যায়। অতএব একথা অনায়াসে বলা যায় যে বাংলা কীর্তনে একইসাথে রয়েছে রাগ-সংগীত ও রাঢ় বঙ্গের লোকজ সংগীতের প্রভাব।

উপ-রাগসংগীত বা ক্লাসিকো-ফোক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলেই প্রকীর্ত গানগুলিকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করা বা সংগীতশাস্ত্রগুলিতে লিপিবদ্ধ করা যায়নি। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রান্তেই এমন অসংখ্য প্রকীর্ত শ্রেণির গান প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। অবশ্য এই প্রকীর্ত গানের বেশিরভাগই বর্তমানে উপ তথা লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের মাঝে অবস্থান করছে। চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পুত্র জগদেকমল্লের ‘সঙ্গীত চূড়ামণি’ (১১৩৭ খ্রিঃ), রাণা কুন্ডের ‘সঙ্গীতরাজ’ (১৫শ শতাব্দী) ও বাংলার বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্তনম’ (১৫শ শতাব্দী) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকীর্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে। চণ্ডীদাস প্রকীর্তকে সকল পদের শীর্ষে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন নামে, যেমন প্রকীর্ত, পকীর্ত প্রভৃতি। অতএব একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যেতে পারে যে, প্রকীর্ত গানের সমগোত্রীয় বলেই সংগীতবিশারদগণ বাংলা কীর্তন গানের মূল উৎসের সন্ধান পাননি।

কীর্তন-তাত্ত্বিক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র কীর্তনের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, “কীর্তন অর্থে সঙ্গীত” না বুঝাইয়া শুধু গুণানুবাদ বুঝাইতেও পারে। যেখানে নবধা ভক্তির লক্ষণ বর্ণনায় কীর্তনের উল্লেখ আছে:

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমানিবেনদনম।।

সেখানে গানই বুঝিতে হইবে, এমন নহে। তবে ইষ্ট দেব-দেবীর যশ, গুণাবলি ও কীর্তিগাথা যদি সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তবে তা অনিবার্যভাবেই কীর্তন গান হবে।

৮ম-৯ম খ্রিস্টাব্দে পূর্বাঙ্গ প্রকীর্ত শ্রেণির গানের মধ্য থেকে কিছু গান বাছাই করে তাদেরকে সাংগীতিক

নিয়মে আবদ্ধ করে এক প্রকার নতুন প্রবন্ধের সৃষ্টি করা হয়েছিল যার নাম ‘বিকীর্ত’ প্রবন্ধ। চর্যাপান, চচ্চরী বা চাঁচর অথবা ‘ধামার’ গান ছিল এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ১৫শ শতাব্দীর আগে বর্তমানের ধ্রুপদ, ধামার বা খেয়ালের মতো কোনো সুনির্দিষ্ট শৈলীর রাগাশ্রয়ী গান ছিল না। তখন শুধুমাত্র প্রবন্ধ বা কম্পোজিশনের প্রচলন ছিল যা ছিল রচয়িতা তথা গায়কের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আবার তৎকালীন সময় প্রবন্ধগুলি তাদের তাল বা ছন্দের নামে পরিচিত হতো যা প্রকীর্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। আর কীর্তন যেহেতু কোনো কাব্যছন্দ বা তাল নয়, তাই প্রাচীনকালের কোনো প্রবন্ধের তালিকায়ই কীর্তনের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কীর্তন কোনো বিশেষ প্রবন্ধ গান থেকে সৃষ্টি হয়নি।

কীর্তনের উৎসস্থল যে অভিজাত দেশি সংগীত, তারই প্রাচীনতম রূপ ছিল প্রকীর্ত গান। আর এই প্রকীর্ত গান ছিল প্রবন্ধ ও লোকসংগীতের মাঝামাঝি এক বিশেষ প্রকারের গান। তাই কোনো কোনো সংগীত গবেষকের মতে প্রকীর্তের অন্যতম ধারা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কীর্তন যা ক্রমে বৈষ্ণব, শৈব ও অপর্যাপর ভক্তি সংগীতের সৃষ্টি করেছিল। প্রকীর্ত গান থেকে যে কীর্তনের উৎপত্তি, তার তিনটি উপধারা রয়েছে- বিষ্ণু বিষয়ক, কৃষ্ণ বিষয়ক এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই তিনটি উপধারাই সম্মিলিতভাবে বৈষ্ণবীয় ধারার স্রষ্টা যা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথক।

প্রারম্ভিককালে বিভিন্ন প্রান্তের বিকীর্ত প্রবন্ধে একইসাথে সাংগীতিক নিয়মানুবর্তিতা ও দেশীয় সারল্যের সহাবস্থান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিজাত প্রবন্ধ তৈরির প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এই নিয়ম হলো কঠোর এবং অপরিবর্তনীয়। এর ফলে সূড় ও আলিম প্রবন্ধের সৃষ্টি হলেও তা খুব বেশিদিন দেশীয় বিকীর্ত প্রবন্ধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়নি।

দ্বাদশ শতকে দেশীয় বিপ্রকীর্ত প্রবন্ধ এতটাই প্রভাব বিস্তার করলো যে তা সূড় প্রবন্ধকে পরিবর্তিত করে সালাগসূড় বা রূপক প্রবন্ধের প্রতিষ্ঠা করলো।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুর্কি-মুসলিম শাসনামলকে মধ্যযুগ বলা হয়। এইসময় ভারতীয় কৃষ্টির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিবর্তন তথা পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তন যে সব ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘটেছে, তেমন নয়। এই মুসলিম শাসনের সূচনালগ্নে ‘অভিজাত সংগীত’ বলতে প্রবন্ধ গানকেই বোঝাত। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের আদিম রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুবিখ্যাত বাঙালি সংগীত-বিজ্ঞানী ডঃ বিমল রায় বলেন, “যা প্রাচীনকালে সুরে ও তালে নিবদ্ধ হতো, তার সাধারণ নাম ছিল গীত বা গান। এই গীত বা গান ভরতমুনির কালে বা কিছু পরে, যখন কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হলো তখন তার নাম হলো প্রবন্ধ”।

মধ্যযুগে প্রচলিত গীতগুলির নাম আমরা পাই আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থ থেকে যা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। তিনি উত্তর ভারতের গীতসমূহকে মার্গ ও দেশি গীত নামে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেশি গীতের তালিকায় তিনি ধ্রুপদ, চন্দ (ছন্দ), ধরু, চুটকলা, তরানা, কওল, বঙ্গলা, বিষণপদ (বিষ্ণুপদ), লহচারী, করকা বা সাদ্রা, কানী বা কালী, জকরী ইত্যাদি গানগুলিকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তালিকার কোথাও কীর্তন গানের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আবুল ফজল গীতশিল্পীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার বর্ণনায় ‘কীর্তনীয়া’-র উল্লেখ করেছেন। যাঁরা মসৃণমুখযুক্ত পুরুষদের স্ত্রীলোকের পোশাকে সাজিয়ে সাবেক ধরনের বাদ্যযন্ত্রসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলা তথা মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ এই কীর্তনীয়ারা ছিলেন মূলত ‘নট’ বা অভিনেতা যাঁরা পরিবেশনার প্রয়োজনে অভিনয়ের সাথে সাথে গানও গাইতেন। কিন্তু তাঁরা ঠিক কী ধরনের গান

গাইতেন তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না হলেও আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী সমকালীন প্রচলিত দেশী বা পল্লীগীতকে নিজেদের পরিবেশনায় ব্যবহার করতেন বলে ধারণা করা যায়। অবশ্য এই কীর্তনের সাথে বর্তমান গবেষণাপত্রের উদ্দিষ্ট কীর্তনের কোনো সাদৃশ্য নেই।

আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে যে ‘লহচারী’ গীতের উল্লেখ করেছেন, সেই শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ‘লাচাড়ি’ শব্দের অপভ্রংশ। আর অভিধান অনুযায়ী ‘লাচাড়ি’ শব্দের অর্থ হলো, নৃত্যোপযোগী ত্রিপদী ছন্দ বিশেষ অথবা ঐ ছন্দে রচিত গান। এই প্রসঙ্গে ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, “তিরহুতের (উত্তর বিহার) ভাষায় প্রচলিত গানকে লহচারী বলে। এই গানগুলি বিদ্যাপতির রচনা এবং উদ্বেলিত প্রেমসঙ্গীত।”^{১১}

বিদ্যাপতির পদসমূহ নৃত্য সহযোগে গীত হত কিনা, প্রমাণভাবে তা নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও তাতে ‘লাচারি’ ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কারণ, সাহিত্য ও সংগীত বিশারদদের মতে, এই ছন্দ ত্রিহুত বা মিথিলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যার ফলে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে মিথিলা ভ্রমণকারী বাঙালিরাও মৈথিলীদের কাছ থেকে এই ছন্দ আত্মস্থ করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সংগীতশাস্ত্রী শ্রী রাজেশ্বর মিত্রের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, “...মিথিলাকে বাংলাদেশ থেকে খুব বিচ্ছিন্ন করে না দেখাই উচিত, কেননা এ দু’টি দেশ একেবারে পাশাপাশি, এছাড়া মিথিলা পঞ্চগৌড়ের অন্যতম ছিল। প্রাচীন যুগে বাঙালিরা জ্ঞান আহরণের জন্য মিথিলায় যেতেন, এইভাবে সেখানকার সংস্কৃতি বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। বিদ্যাপতির গান এইভাবে মুখে মুখে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়েছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ ‘লাচাড়ি’ বা ‘লাচারি’-র কথা বলা যেতে পারে। শিবের স্তুতি উপলক্ষে মিথিলায় ‘লাচাড়ি’ গাওয়া হত। সম্ভবত এই নামটি শিবের নাচ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পরবর্তী যুগে

লাচাড়ি বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। শৈব মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রায় প্রত্যেক গানে লাচাড়ির উল্লেখ আছে।”^{১২}

এই লাচাড়ি একপ্রকার দেশজ গীতরীতি যার গায়ন-ভঙ্গি অনেকটা পল্লী গীতাশ্রয়ী বলে ধারণা করা যায়। অতএব প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলায় যে মহাজন রচিত পদগুলি প্রচলিত ছিল তা লাচাড়ি চণ্ডেই গাওয়া হতো বললে বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না। তৎকালীন উত্তর ভারতীয় অভিজাত সংগীতের সাথে সাদৃশ্যহীন এই লাচাড়ি রীতিটিই সম্ভবত অভিজাত দেশীয় রীতি ছিল। অতএব এটি ছিল এক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক তথা দেশজ রীতি। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা তথা গুণকীর্তনের নিমিত্ত একটি স্বকীয় রীতি বাঙালির ছিল বলেই সংগীত গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে এই রীতি থেকেই জন্ম নেয় গরাণহাটি, রেণেটি, মনোহরশাহী ইত্যাদি কীর্তনের বিশিষ্ট গেয়-ভঙ্গি।

প্রাচীন গান্ধর্ব সংগীতে এই গেয়-ভঙ্গিকে ‘গীতি’ বলা হয়েছে। যদিও গান্ধর্বগণ নিজেদের পরিবেশিত গান্ধর্ব সংগীতে এই গীতির ব্যবহার করতেন আবশ্যিকভাবেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গীতির রূপরেখা গৃহীত হয়েছিল আঞ্চলিক তথা দেশী গানের গেয়ভঙ্গি থেকেই। এইজন্যই গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে দেশজ অর্থাৎ আঞ্চলিক গীতভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রাখা সংগীতের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যা অভিজাত ও পল্লীগীতি, উভয় ক্ষেত্রেই মেনে চলা হয়। সুতরাং ভাষা-পার্থক্যের মতো গেয়ভঙ্গি থেকেও দেশীয় গানের অঞ্চল-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব। এই রীতি অনুযায়ীই প্রাক্-চৈতন্য যুগে অবিভক্ত বঙ্গে যেসব বৈষ্ণব মহাজন তথা পদাবলীকারদের রচনাসমূহ প্রচলিত তথা জনপ্রিয় ছিল সেগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- ১) মিথিলার লাচাড়ি ঢং-আশ্রিত অভিজাত কীর্তন-জাতীয় গান, ২) উপ-আঞ্চলিক পল্লীগীতাশ্রয়ী গান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর ভক্তিবাদ আন্দোলনে পূর্ব ভারতের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবেরা ‘কীর্তন’কে, পশ্চিম ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ‘ভজন গান’কে, উত্তর ভারতের মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের বৈষ্ণবগণ ‘বিষ্ণু পদ’কে এবং দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব সমাজ ‘কীর্তন’কে স্বীয় ধর্ম-সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাথমিক বিকাশ এবং এর সাথে কীর্তনের প্রাচীন ইতিহাস, ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। তাই অবিভক্ত বঙ্গে কীর্তনের উৎস অনুসন্ধানের বাংলায় প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লিপি লেখনের বিশ্লেষণ জরুরি। সেই সূত্রে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে পুষকর্ণার (বর্তমান পার্গো গ্রাম) রাজা চণ্ডবর্মা যে চক্রস্বামী বা চক্রধারী বিষ্ণুর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটাই সম্ভবত গৌড়বঙ্গে প্রদ্যুম্নেশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণের প্রথম মন্দির ছিল। এছাড়াও আরও নানান জায়গায় কোকাবরাহস্বামী অথবা শ্বেতবরাহস্বামী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তদুপরি বাংলায় যেসব প্রাচীন লিপি-লেখন ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই পূর্ব ভারতের পুরাণ ও লোকসাহিত্যে বিষ্ণুলক্ষ্মী সম্বন্ধীয় কাব্য-কাহিনীর তুলনায় ভাগবতাক্তে কৃষ্ণলীলাই অধিক জনপ্রিয় হয়ে সাধারণ মানব মননে স্থায়ী আসন পেতেছে।

অবশ্য সেন রাজবংশের রাজত্বকালেই প্রধানত বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে, কেননা সেন রাজারা ছিলেন মূলত শৈব এবং বৈষ্ণব মতাবলম্বী। এই বংশের রাজাদের মধ্যে মহারাজা বিজয় সেন সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণের (প্রদ্যুম্নেশ্বর) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেন রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ মহারাজা

লক্ষ্মণ সেন নিজে শুধু পরম বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁর রাজত্বকালেই কীর্তন তথা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সর্বাপেক্ষা বেশি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তাঁর সভাকবি শ্রী জয়দেব গোস্বামীই রচনা করেন “শ্রীগীতগোবিন্দ” এবং বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে আদিকবি হিসেবে তিনি চির-শ্রদ্ধেয়। দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে আদিসের আধারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জয়দেবের “শ্রীগীতগোবিন্দ”-ই বাংলা পদাবলী কীর্তনের আদি নিদর্শন হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন প্রবন্ধানুযায়ী রচিত গীতরীতি, সহজে বোধগম্য সরল ভাষা ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সংক্রান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের কারণে সুললিত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থটি উত্তরকালের বাঙালি পদাবলীকারদের এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে কবি জয়দেব গোস্বামী বাংলা কীর্তনের আদিকবি তথা মহাজনের আসনে চিরভাস্বর।

বাঙালি জয়দেব গোস্বামী যেমন সংস্কৃতে পদ রচনা করে ও হয়েছিলেন বাঙালি বৈষ্ণব পদকর্তাদের পথিকৃৎ, তেমনি পরবর্তীতে যিনি বৈষ্ণব পদাবলীর জয়ধ্বজা উড়িয়ে হয়েছিলেন মহান বৈষ্ণব পদাবলীকারদের পথপ্রদর্শক, তিনিও প্রকৃতপক্ষে বাঙালি ছিলেন না। সমস্ত জীবনে যিনি একছত্রও বাংলা লেখেননি, কাব্য তথা পদ রচনার পারদর্শিতা এবং উত্তরকালের পদকর্তাদের ওপর তাঁর অভূতপূর্ব প্রভাব বিবেচনায় তাঁকেই প্রাক-চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন বিদ্বৎ সংগীত গবেষকেরা। তিনি হলেন মিথিলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও পদাবলীকার বিদ্যাপতি ঠাকুর। ব্যক্তিগত জীবনে শৈব মতাবলম্বী এই কবির রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত পদগুলি মিথিলা প্রবাসী বাঙালি ছাত্রদের কণ্ঠে ও স্মৃতিতে বাহিত হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। তখন থেকে বাংলার পদকর্তাদের পরম যত্নে সেগুলি সংরক্ষিত ও অনুসৃত হয়েছে এবং মূলত এই পদসমূহের ভাষা অনুসরণ করতে গিয়েই

সৃষ্টি হয়েছে পদাবলীর অন্যতম আকর্ষণ, কৃত্রিম সাহিত্যভাষা “ব্রজবুলি”।

বিদ্যাপতির ভাষা, ভাব ও রচনাকৌশলের পরে যাকে নিয়ে বাংলা পদাবলী কীর্তনের জগতে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা নামক স্থান থেকে একটা বেশ বড় কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পুঁথির আবিষ্কর্তা শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, যিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি এবং বিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিতভাবে এই পুঁথির লিপি বিচার করে একে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলে মত দেন এবং পুঁথির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকেই আদিম চণ্ডীদাসের স্বীকৃতি দান করেন।^{১৭} প্রাচীন পুরাণ-অনুসারী এবং শ্রীগীতগোবিন্দ ও সর্বোপরি স্থানীয় লোকসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের ভাব ও ভাষা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর বিতর্ক থাকলেও বাংলা কীর্তনের ইতিহাসে এর ভূমিকা ও প্রভাব অনস্বীকার্য।

আবার অবিভক্ত বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা পাই যে, এই বঙ্গে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পূর্ববর্তী সময় থেকেই ভগবৎ-ভক্তি সম্বন্ধিত কীর্তন প্রচলিত তথা জনপ্রিয় ছিল যা ‘নাম কীর্তন’ হিসেবে পরিচিত। চৈতন্য-জন্মের সময়ও ‘হরি-সঙ্কীর্তন’ গীত হয়েছিল।

“হেনমতে প্রভুর হৈল অবতার
আগে হরি-সঙ্কীর্তন করিয়া প্রচার।
দশদিগে পূর্ণ হই উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনে হাসে দ্বিজমণি।”^{১৫}

‘পদ্ম-পুরাণ অনুসারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংগীতে নৃত্যের ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ ছিল, “কৃষ্ণ-ভক্ত যখন নৃত্য করেন, তখন তাহার প্রভাবে বহু প্রকার অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। তাঁহার নৃত্যপর চরণযুগল ধরণীর, সঞ্চালিত নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি দিগসমূহের এবং নৃত্যকালে উর্ধ্বোখিত বাহুদ্বয় সুরপুরের অমঙ্গল নাশ করে।”^{১৬} তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, প্রাক-চৈতন্য যুগে প্রচলিত এই হরিসঙ্কীর্তনে নৃত্যের ব্যবহার হতো। আজও বৈষ্ণব গায়কগণ নাম-কীর্তন করার সময়ে ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে দু’হাত ওপরে তুলে নৃত্য করেন সম্ভবত পূর্বোক্ত প্রাক-চৈতন্য যুগের হরিসঙ্কীর্তনের রীতি অনুযায়ীই। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-পরবর্তী সময়ে মহাপ্রভুর ইচ্ছা ও চেষ্টায় উক্ত নামসঙ্কীর্তনে কিছু নতুন ও অভিনব পদ্ধতির সংযোজন হয়েছিল।

‘শ্রী শ্রীচৈতন্য ভাগবত’ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রী বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনের যে সুস্পষ্ট চিত্র এঁকেছেন তাতে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নাম-সঙ্কীর্তনে একজন মূল গায়ক ও তাঁর চারদিক ঘিরে সহকারী একাধিক গায়কগণ থাকতেন। আবশ্যিক নৃত্যসহ উপস্থাপিত এই নামকীর্তনে গায়কগণ মাঝে মাঝেই উচ্চস্বরে “হরিবোল” উচ্চারণ করতেন। মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল ও শঙ্খ ছিল এই সঙ্কীর্তনে ব্যবহৃত সহযোগী বাদ্যবিশেষ। এই সঙ্কীর্তনে নিবদ্ধ গীতের সাথে সুর হিসেবে বিভিন্ন ‘রাগ’ প্রযুক্ত হতো এবং সমবেত নৃত্যের সাথে দ্রুত লয়যুক্ত তালের ব্যবহার হতো।

বাংলা ও বাঙালি সমাজ যখন অরাজকতার চূড়ান্ত অবস্থায়, তখন মানুষকে অন্যায় ও পাপের পথ থেকে উদ্ধার করতে অগ্রণী ও কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি ধর্মের কঠিন তত্ত্ব ও তার

ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে না গিয়ে মানুষকে সরল ও সাধারণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ভক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং এই কাজে তিনি হাতিয়ার করলেন কীর্তনকে। নব্যরীতির ব্যাপক জনপ্রিয় নামসঙ্কীর্তন ছাড়াও সুনির্দিষ্ট গীতরীতির পদাবলী লীলাকীর্তনও মহাপ্রভুরই কীর্তি। বৈষ্ণব পদাবলীর শৃঙ্গার রসাত্মক সাহিত্যকে তিনি ভক্তি-সমর্পিত প্রেমরসে পরিণত করেছিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবেই বাংলা পদাবলী কীর্তন হয়ে উঠেছিল আপামর বাঙালি জাতির প্রাণের সংগীত।

শ্রী চৈতন্যের অবিস্মরণীয় কীর্তিকে তাঁর অবর্তমানে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তথা বাংলা পদাবলী কীর্তনকে আরও মহিমান্বিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুরের জমিদার শ্রী কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রী নরোত্তম দত্ত তথা নরোত্তম ঠাকুর।

তাঁরই উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের গড়ের হাট বা গরানহাট পরগণার খেতরি গ্রামে এক সুবৃহৎ বৈষ্ণব সমাগম ও কীর্তন মহোৎসব আয়োজিত হয় যা খেতরি মহোৎসব নামে খ্যাত। এখানেই প্রাচীন প্রবন্ধ গীতাশ্রয়ী এক অভিনব কীর্তন গীতরীতির প্রবর্তন হয় যা পরবর্তীতে গড়ের হাটি বা গরানহাটি কীর্তন নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই রীতির অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও চার প্রকার কীর্তন গায়নরীতি প্রচলিত হয়- মনোহরশাহী, মন্দারিনী, রেনেটি ও ঝাড়ুখণ্ডী।^{১৭}

উপসংহার

এইভাবেই প্রাচীন প্রবন্ধ গীত থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা কীর্তন গানের সৃষ্টি। যা একসময় শুধুই ধর্মীয় গীতরূপে চিহ্নিত হতো, আজ তা স্বমহিমায় বাংলা সাহিত্য ও গীতের এক অনন্য ধারা হিসেবে সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত ও খ্যাত। যতদিন বাংলা সাহিত্য

থাকবে, বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনও ততদিন আপামর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমানসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এখানেই বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থকতা, বাঙালি সংস্কৃতির চিরগৌরব।

তথ্যনির্দেশ

১. এ ট্রাইলিঙ্গুয়াল স্যাংস্কট ডিকশনারি (A Trilingual Sanskrit Dictionary), স্যাংস্কট কলেজ প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ
২. ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, প্রসঙ্গ: বাংলা কীর্তন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, সংখ্যা ৬
৩. পূর্বোক্ত
৪. শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
৫. সঙ্গীত রত্নাকর- শাস্ত্রদেব, অনুবাদ: ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ
৬. পূর্বোক্ত
৭. ড. বিমল রায়, ধ্রুপদ প্রসঙ্গ, রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান মিউজিকলজি, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৪
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৯. শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬১, পৃ. ১৩
১০. সঙ্গীত শব্দকোষ (২য় ভাগ), ড. বিমল রায়, সম্পাদনা: ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ
১১. শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা, লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬১, পৃ. ১৩
১২. পূর্বোক্ত

১৩. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ২১৬, ২১৭,
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬, ২২৭
১৫. শ্রী বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত- মধ্যখণ্ড, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, বসুমতী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ
১৬. শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
১৭. সুদেষ্ণা বণিক, সঙ্গীতে বাংলা কীর্তনের প্রয়োগরীতি: দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান, নক্ষত্র প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৫, ২৬

সমান্তরাল যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যের অধ্যাত্ম জীবনযাপন ও সাধনার বিশ্লেষণ

সৌরভ দাস

সারসংক্ষেপ

সৌরভ দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শিলিগুড়ি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
পিএইচডি গবেষক
বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: souravdas757@gmail.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপরীতকামী বা বিসমকামী যৌন অভিযুক্তের বাইরে অবস্থিত যৌনতাকে ‘সমান্তরাল যৌনতা’ বা ‘Parallel Sexuality’ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ লক্ষ করা যায়। তবে বর্তমান প্রবন্ধে সমকামী পুরুষসত্তা এবং তার মধ্যে থাকা নারীসত্তাকামী পুরুষের ভাবধারার বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত মধ্যযুগের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাত্ম পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবন ও সাধন প্রণালীর মধ্যে এই সমান্তরাল যৌনতার ভাবটি কতখানি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, সে বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো ধর্ম বা তাঁদের সাধনাকে ছোট করে দেখা কিংবা নিন্দার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রচেষ্টায় নয়, বরং সাধারণভাবেই শ্রীচৈতন্যের সাধন প্রণালী ও ভাবধারায় এ বিষয়টি ঠিক কীভাবে রূপ নিয়েছে, পাশাপাশি তাঁর মধ্যে থাকা সমান্তরাল যৌনতার একজন মানুষের ছবি বা নারীসত্তাকামী পুরুষের ছবি ঠিক কেমন ভাবে ধরা পড়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যা তৎকালীন মানুষের চোখে ভক্তি রসান্বিত মনে হলেও, তাঁর মধ্যে রূপান্তরকামী সাজসজ্জা, সমকামীভাবনার বেশ কিছু দিক অত্যন্ত স্পষ্টতার সঙ্গে লক্ষ করা গেছে। পাশাপাশি তাঁর সাধনার ধারাটির মধ্যেও সমান্তরাল যৌনতার উপস্থিতি কখনো পরোক্ষভাবে ও কখনো প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে বলেই মনে হয়েছে।

মূলশব্দ

সমান্তরাল যৌনতা, নারীসত্তাকামী, বৈষম্যবধর্ম, গৌরনাগরীভাব, সখীভেকি

ভূমিকা

ভারতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি-ধর্ম এগুলিকে একটু নিবিড়ভাবে দেখলেই তার অধ্যাত্মবাদের মধ্যে

থেকে প্রস্ফুটিত হয় সমান্তরাল যৌনতা ও সংস্কৃতির এমন একটি ভাবনা, যা বহুকাল থেকেই ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে মিশে রয়েছে। এক্ষেত্রে

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) অধ্যাত্ম জীবনযাপন ও সাধনার ধারাটিতেও এই বিষয়টি পরিপুষ্ট হতে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নদীয়া জেলার নবদ্বীপে। পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। শৈশবকালে তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর, ওরফে নিমাই। শৈশবাবস্থা থেকেই চৈতন্যের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে বেশ কিছু ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাবরূপ পরিলক্ষিত হয় যা তাঁকে অন্যান্য বৈষ্ণব শিশুদের থেকে পৃথক করে তোলে। বৈষ্ণবচার্যরা মনে করেন নিমাই ওরফে শ্রীচৈতন্য ‘রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত’ কৃষ্ণস্বরূপ। এক্ষেত্রে চৈতন্যকে ঈশ্বরভাবে ভাবিত চৈতন্য পরিকরবৃন্দ এমন কিছু বক্তব্য তাঁদের গ্রন্থে রেখে গেছেন, যা থেকে চৈতন্য-চরিত্রের মধ্যে একটি নারীসত্তাকামী ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ, বহিরঙ্গে রাধা। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাংলার এমন এক প্রবাদপ্রতিম পুরুষ যাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় ভাবধারা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। চৈতন্য পূর্ববর্তী সংস্কৃতিতে যেখানে পৌরুষত্ব বলতে একটি হিংস্র-বলিষ্ঠ-উগ্র মানসিকতাকে বোঝাত, সেখানে চৈতন্য পরবর্তী সময়ে পৌরুষত্বের মধ্যে নারী এবং পুরুষের সমভাবের বিশেষ মিশ্রণকে লক্ষ করা যায়। যার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ-কোমল-নমনীয় ভাবের আগমন হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন চৈতন্যজীবনীকারদের আলোচনা থেকে চৈতন্যের ব্যক্তিজীবন ও ভাবসাধনার মধ্যে যে সমান্তরাল যৌনতার বীজটি প্রোথিত রয়েছে, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

পদ্ধতি

প্রবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক এবং এটিতে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন আকর গ্রন্থ এবং সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গবেষণাপত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য জন্মের হেতুস্বরূপ বলেন,-

“এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।

যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম।।

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।

যুগধর্মকাল হইল সে কালে মিলন।।

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।

আপনে আশ্বাদে, প্রেম নাম সংকীর্তন।।”^১

এই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমস্বাদ গ্রহণের বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাভাবস্বরূপিনী রাধার ভাব গ্রহণ করে নিজ প্রেমস্বাদাকাক্ষা পরিতৃপ্ত করেছিলেন,-

“ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।

তাঁর মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।।

প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম।

কৃষ্ণের মাধুরী আশ্বাদনের কারণ।।

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।

সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাদ্ধ শ্রীহরি।।”^২

একদা শ্রীরাধার প্রেমকে অনুভব করার ইচ্ছা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের, সেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সেই ইচ্ছা রাধাকে জানান এবং শ্রীরাধা বলেন যে, তাঁর প্রেমকে অনুভব করতে হলে শ্রীকৃষ্ণকে রাধা হতে হবে এবং এই শুনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকা হবার বাসনা জন্মায়। চৈতন্যচরিতামৃতকারের কথায়-

“শ্রী রাধায়ঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানায়ৈবা

স্বাদ্যো যেনোদ্ধত মধুরিমা কী দৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যধ্বগসা মদনুভবতঃ কী দৃশং বেতি

লোভাওড়াবাঢ়্য

সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরিন্দুঃ।।”^৩

-অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কীরূপ এবং শ্রীরাধা তাঁর প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণের কীরূপ মাধুর্য আশ্বাদন

করেন, সেই মাধুর্যকে আশ্বাদন করলে তাঁর সুখই বা কী রকম হয়, এসব কিছু জানার উদ্দেশ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শচীদেবীর গর্ভে গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর জীবনচর্যায় জনসাধারণকে এই বার্তাই দেন। তাই রায় রামানন্দের যে পদটি বারংবার তিনি কীর্তন করেছেন, সেখানেও তাঁর মধ্যকার রাধা ও কৃষ্ণ উভয় ভাবের বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে,—

“ন সো রমণ না হাম রমণী।

দুহঁ মন মনোভাব পেশল জানি।।”^৪

—তিনি পুরুষও নন, স্ত্রীও নন, দুই সত্তার মনোভাবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ক্রমে মধুর রসের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর ভজনাই তাঁর কাছে সর্বোত্তম। অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে কান্তাভাবের প্রয়োজন। ভগবানকে প্রেমিকরূপে লাভ করার অনুপম শিক্ষা তিনি আপামর জনগণকে দান করলেন।—

“কৃষ্ণ প্রেমে আমরা সন্ধ্যাস নিয়েছি

আমরা সবাই রাধা, পরম আরাধনায় তাঁকে পেতে চাই

তুমি আমার সঙ্গী হবে না?”^৫

এবং এই ভাগবৎ প্রেম শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিতে দুই প্রকার— স্বকীয়া এবং পরকীয়া। তিনি পরকীয়া প্রেমসাধনার সাধক, সে প্রেম অহৈতুকী প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রেম। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে তাঁর সাধনার মধ্যে নারীভাব, যা বৈষ্ণব দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাধাভাব এতটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শ্রীচৈতন্যের নিজ রচনার মধ্যেও সেই দিকটি ধরা পড়ে,—

“আশ্লীষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।”^৬

অর্থাৎ, আমাকে আলিঙ্গন করো বা পদতলে পিষ্ট করো অথবা আমাকে দেখা না দিয়ে মর্মাহত করো, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন করো। ওহে লম্পট! এতৎসত্ত্বেও তুমিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ আমি অন্য কাউকে কামনা করি না। এবং এই একই শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথায়—

“আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেঁহে রস সুখ রাশি

আলিঙ্গিয়া কর আত্মসাৎ।

কি বা না দেন দরশন জারেন মোর তনুমন

তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ।।”^৭

লক্ষণীয় ‘প্রাণনাথ’ শব্দটি, কারণ একজন নারীর স্বামী বা বিবাহিত পুরুষকে তাঁর প্রেমিকা বা স্ত্রী ‘প্রাণনাথ’ বলে সম্বোধন করেন। পরকীয়া প্রেম সাধনায় রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর ‘প্রাণনাথ’ বলে মনে করেছেন, বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণবীয় মধুর রসের সাধনায় যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ আর ভক্তমাত্রই নারী, তাই গৌরাঙ্গ নিজে নারীবেশ ধারণ করেছেন। যেমন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য তাঁর পার্শ্বদেবের সঙ্গে নারীবেশ ধারণ করে নৃত্যলীলার অভিনায় ব্যক্ত করেছেন,—

“একদিন প্রভু বলিলেন সভা-স্থানে।

আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে।।

শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।

যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার।।

লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।

সকল বৈষ্ণব রঙ্গ বাটিল প্রচুর।।”^৮

আবার লোচন দাস-এর চৈতন্যমঙ্গলেও একইভাবে দেখা যায় চৈতন্য গোপীবেশে নৃত্যরতা।—

“এখানে কহিব শুন, সাবধানে সবজন,

গোপিকা আবেশ-বশ প্রভু।

হৃদয়ে কাঁচলে ধরে, শঙ্খ-কঙ্কন করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু ।।
পট্ট সে বসন পড়ে, নূপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝখানি ।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাঁহে
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ।।”৯

এমনকি ভাবতন্ময় শ্রীচৈতন্য কখনো কখনো জননীর
বাৎসল্যে পরিপূর্ণ হয়ে, তাঁর ভক্তদের স্তন্যপান
করাতেও আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ভক্তগণও যেন
গৌরাঙ্গের সেই মাতৃমূর্তি দেখে ভাবাপ্লুতবশত
চৈতন্যের স্তন্যপানের মধ্য দিয়ে ধন্য হয়ে যেতেন।
চৈতন্যভাগবতকার সে কথাও ব্যক্ত করেছেন—

“মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ ।
এই মত সভারে দিলেন প্রভু ভাব ।।
মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সবারে ধরিয়।
স্তন্যপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ।।
আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান ।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান ।।”১০

এই জীবনীকারগণ যদিও চৈতন্যের সাধন পর্যায়ের
লক্ষণগুলির মধ্যে তাঁর ঐশ্বরিক ভাবটিকেই দেখাবার
প্রচেষ্টা করেছেন, কিন্তু আধুনিক পাঠকের চোখে
চৈতন্যের এই ভাবের মধ্যে দিয়ে তাঁর শরীরে
এবং মনে নারীসত্তাকামিতার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে
উঠেছে। এমনকি নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে পরিভ্রমণে
এসেও শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে বিভোর—

“রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান ।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান ।।”১১

এ পর্যন্ত চৈতন্যের মধ্যে রাধিকার ভাবাবেশ
পরিচলিত হয়েছে, যেখানে গৌরাঙ্গ নিজেকে
রাধাভাবে ভাবিত হয়ে নারীসজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে

তুলেছেন। অন্যদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তদের মধ্যে
আরও একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যেখানে শ্রীচৈতন্য
কৃষ্ণ এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ গোপিনীরূপে পরিকল্পিত
হন। এক্ষেত্রে চৈতন্যের সব থেকে নিকটতম পার্শ্বদের
উল্লেখ মেলে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত। বৈষ্ণব মহাজনেরা
মনে করেন, শ্রীল গদাধর গৌরের হ্রাদিনী শক্তি।
চিরকুমার গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে তাঁর প্রাণপূরুষ
বলে মনে করতেন। তাই সুরসিক ভক্ত বৈষ্ণবের
কাছে শ্রীগৌরাঙ্গের অপর নাম ‘গদাধর-প্রাণনাথ’।
যে কারণে চৈতন্যজীবনীকারেরা যখন গৌরাঙ্গকে
শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন, সেখানে
তাঁর দুই স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁরা
রাধারূপে ভাবেননি, পরিবর্তে শ্রীল গদাধরকে রাধার
ভূমিকায় গ্রহণ করেছেন। তাই চৈতন্যচরিতামৃতকার
বলেছেন—

“বড় শাখা, গদাধর পণ্ডিত-গোঁসাইঞ ।
তেহোঁ লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাঞি ।।”১২

কিংবা লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে উল্লেখ
করেছেন—

“গৌড়দেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ।।”১৩

লক্ষণীয় চৈতন্যচরিতকারগণ বারবার একথা উল্লেখ
করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর
রাধা হলেন গদাধর পণ্ডিত। অন্যদিকে স্বরূপ
গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, শিবানন্দ সেন, সনাতন
গোস্বামী, নরহরি সরকার প্রমুখ শ্রীরাধিকার অন্যান্য
সখীস্বরূপ— বিশাখা, রূপমঞ্জরী, বীরদুতি, রতিমঞ্জরী
ও মধুমতী রূপে কল্পিত হয়েছেন। লোচনদাসের
চৈতন্যমঙ্গলে এও দেখা যায় সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে
শ্রীচৈতন্য নিজ গৃহে গদাধরের সঙ্গে একত্রে রাত্রিবাস
করতেন। এমনকি চৈতন্যের সঙ্গে রাত্রিবাসের জন্য

গদাধর সর্বদা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। এমনকি অমিয় নিমাই রচিত গ্রন্থে শিশিরকুমার ঘোষ উল্লেখ করেছেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বকালে অনেক সময়ই নিমাইয়ের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সরিয়ে দিয়ে গদাধর তাঁর পদসেবায় বসতেন। চৈতন্যমঙ্গলের থেকে এও জানা যায়, চৈতন্য নিজেও গদাধরের প্রতি যথেষ্ট প্রেমানুরক্ত ছিলেন। গদাধরের সেই দুর্লভ প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে চৈতন্য নিজ অঙ্গমালা গদাধরের গলায় পরিয়ে দেন।-

“পাইবে দুর্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে।
নোরথ সিদ্ধি হইব বৈষ্ণব-প্রসাদে।।
ইহ বলি অঙ্গমালা দিলা তার গলে।
প্রভাতে আইলা সভে প্রভু দেখিবারে।।
সভারে কহিল প্রভু রজনীচরিত।
কথা ছলে প্রেম লভে গদাধর পণ্ডিত।।
এই মত প্রতিদিন করে পরিচর্যা।
শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা।।”^{১৪}

যদি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের দিকে চোখ রাখা যায়, সেক্ষেত্রেও দেখা যাবে চৈতন্য গদাধরকে তার ‘গৃহিণী’ বলে সম্বোধন করেছেন। এমনকি তাঁর মাতা শচী ঠাকরণকে নির্দেশ দিয়েছেন, বিভিন্ন অলঙ্কার এবং সাজসজ্জা যেন তিনি গদাধরকে দান করেন।

“গৌরচন্দ্র বলেন মা গদাধরের আমি।
নানা অলঙ্কার দিয়া ঘরে রাখো তুমি।।
শ্রীরামের সীতা জেন কৃষ্ণের রুক্মিণী।
গৌরঙ্গের গদাধর জানিও জননী।।
আমি গৃহস্থ গদাধর গৃহিণী।
আমি উদাসীন গদাধর উদাসিনী।।”^{১৫}

অর্থাৎ শ্রীল গদাধর এখানে চৈতন্যের প্রেমিকা ও গৃহিণীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। যে গদাধর মহাপ্রভুকে এতখানি ভালবাসেন, সেই মহাপ্রভু বাংলা ছেড়ে

উড়িষ্যায় চলে গেলে, প্রিয়তমের বিরহে কাতর গদাধর কিছুদিনের মধ্যেই পুরীধামে গিয়ে উপস্থিত হন। এমনকি মহাপ্রভুর রহস্যজনক অন্তর্ধানের কিছুদিনের মধ্যেই গদাধর পণ্ডিত প্রিয়তম বিরহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গৌরঙ্গ এবং গদাধরের এই প্রেমলীলা বৈষ্ণব সমাজে সাধন ভজনের একটি উপায় হিসেবে সমাদৃত হয়। ‘গদাই-গৌরঙ্গ’ নাম নিয়ে মহাপ্রভু ও শ্রীল গদাধরের যুগলমূর্তি তাঁরা আরাধনা শুরু করেন। যেখানে চৈতন্যের বামদিকে গদাধরের মূর্তি রক্ষিত হয়, লক্ষণীয় ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্ত্রী বা প্রণয়িনীর অবস্থান পুরুষের বামপাশে। যে কারণে নারীর অপর নাম বামা, এবং গৌর-গদাধর মূর্তির ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ গৌরঙ্গের বামপাশে রাধিকা গদাধরের মূর্তিটি শোভা পায়। এবং বৈষ্ণব সমাজে এটি একটি পৃথক গোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। এ সম্পর্কে গবেষক ভাস্কর চৌধুরী বলেন—

“‘গদাই-গৌরঙ্গ’ নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একটি গোষ্ঠী ছিল। এরা গৌরঙ্গ ও গদাধরের যুগল মূর্তির আরাধক। তবে নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর আধিপত্যে গৌর-নিতাই যুগলমূর্তি পরবর্তীকালে অনেক বেশি জনাদৃতি পায়। নিত্যানন্দের সাংগঠনিক শক্তি অনেক বেশি থাকায় চৈতন্য স্বয়ং বৈষ্ণব সমাজে নিতাইয়ের অপ্রতর্ক গুরুত্ব আরোপ করেন। গৌর-নিতাই যুগলকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ভ্রাতৃত্বের ধাঁচে ফেলা হয়েছে। নিত্যানন্দ এখানে কৃষ্ণভ্রাতা বলরাম হিসেবে কল্পিত। আর কমলীয়কান্তি গদাধরকে নারীসত্তার প্রতীকরূপে কল্পনা করে গৌরঙ্গ-গদাধরের যুগলকে সমপ্রেমী সম্পর্কের আধারে ব্যাখ্যা করেছেন জীবনীকারগণ।”^{১৬}

গৌর-গদাধর প্রেমলীলার বর্ণনায় ভক্ত বাসুদেব ঘোষ, তাঁর পদে বলেন—

“ঝুলত গৌরাচাঁদ সুন্দর রঙ্গিয়া ।
 প্রেমভরে হৈয়া ডগমগিয়া । ।
 রাধার ভাবেতে ধারা বয়ানেতে ভাসে ।
 ভাব বুঝি গদাধর ঝুলে বাম পাশে । ।”^{১৭}

চৈতন্য ভক্তদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ তথা নাগর এবং নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী হিসেবে ভাবার মধ্য দিয়ে যে সাধন প্রণালী পরিপুষ্টতা পেয়েছে, সেটিকে ‘গৌরনাগরীভাব’ বলা হয়। শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর এই গৌরনাগরীভাবের মূল প্রবক্তা। যে ভাবসাধনায় গৌরাঙ্গদেব প্রেমিক বা পুরুষোত্তম এবং ভক্তরা সকলেই তার নাগরী বা প্রেমিকা। চৈতন্যজীবনীকার লোচনদাস ঠাকুর এই গৌরনাগরীভাবে সারাক্ষণ মগ্ন থাকতেন। এই গৌরনাগরীভাব, গৌরপারম্যবাদ নামেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, গৌরগত প্রাণ, গৌরসঙ্গী, গৌরঅনুচর, গৌর অঙ্গেই রাধাকৃষ্ণের লীলার বিলাস নিত্য অনুভব করেছেন। গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর- এই চারজন একত্রে ‘পঞ্চতত্ত্ব’ নামে পরিচিত। যেখানে শ্রীচৈতন্য-শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-বলরাম, অদ্বৈত-মহাদেব, শ্রীবাস-নারদ, গদাধর-রাধা অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁরা গৌরাঙ্গকে অবতার জ্ঞানে ভাবিত ছিলেন এবং নিজ শিষ্যগণকে গৌরপূজার নির্দেশ দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ তাঁদের কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমঘন মূর্তি বলে অবধারিত হন। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের মর্ত্যলীলা চৈতন্যকে তথা গৌরকে কেন্দ্র করেই পরিপুষ্টতা পেয়েছে। তাই তাঁরা সর্বদা গৌরাঙ্গের ভজন কীর্তন করে চলেছেন,-

“যদি গৌর না হ’ত কেমনে হইত
 কেমনে ধরিতাম দে ।
 রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
 জগতে জানাত কে । ।”^{১৮}

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ যেখানে পুরুষ এবং বাকি ভক্তরা সেখানে নারী হিসেবে তাঁর ভজনা করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই একটি ‘হোমো এরোটিক’ ভাবনা এই গৌরনাগরীতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখায় সখীভেদিক সাধন আরো একটি অতি গূঢ় সাধনপ্রণালী। এখানে ভক্তরা নিজেদেরকে শ্রীরাধার দাসী মনে করেন। ভগবান নিজের থেকে তাঁর ভক্তদের সদাসর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তাই ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য তাঁর লীলাসঙ্গিনীদের উচ্চস্থান-এইরূপ ভাবনায় ভাবিত হয়ে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার প্রেমলীলার পরিপুষ্টির জন্য নিজেদেরকে শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী বা সখী হিসেবে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বর সাধনার জন্য ভগবানের প্রধান সঙ্গিনীর অনুগতা দাসীর ভাব গ্রহণ করে এই সকল ভক্তগণ সাধনানন্দ লাভ করতে চেয়েছেন। এই প্রণালীতে পুরুষেরা নিজেদেরকে শ্রীরাধিকার দাসী বলে পরিচয় দান করেন। সেই সঙ্গে মাথায় লম্বা চুল রাখেন, শাড়ি, ঘাগড়া, ওড়না ইত্যাদি পরিধান করেন এবং সর্বদা নারীবেশে সুসজ্জিত হয়ে ঈশ্বরসেবায় নিমগ্ন থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার এই সখীভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন,-

“রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
 দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর । ।
 সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ।
 সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার । ।
 সুখ বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয় ।
 সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয় । ।
 সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ।
 সখী ভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি । ।
 রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায় ।
 সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় । ।”^{১৯}

এই সখীভেকি সাধনপ্রণালীর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া সাধিকা হলেন নবদ্বীপের সমাজবাড়ির শ্রীমতি ললিতা সখী। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যিনি নবদ্বীপের শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই চরণদাস বাবাজীর এক অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস গোপীভাবের সাধনা করেছেন। চৈতন্যদাসের কাছ থেকেই গোপালকৃষ্ণ সখী-দাসী ভাবের সাধনার সন্ধান পান। তাঁর গুরুদত্ত ভেক নাম হয় ললিত দাসী। এই ভেক ধারণের পর তিনি আজীবন কুলবধূর মতো আশ্রমেই থেকেছেন। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তেরা তাঁর দর্শনের জন্য সমাজবাড়িতে উপস্থিত হতেন। তিনি সর্বদাই শাড়ি পরিধান করতেন এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে সকলকে পরিবেশন করতেন। আশ্রমের চৌহদ্দির বাইরেও তিনি খুব একটা বেরোতেন না। যতদিন জীবিত ছিলেন বড় নিষ্ঠা সহকারে তিনি আশ্রমের সকলের সেবা করতেন। ললিতাসখী প্রবর্তিত এই গোপীভাবের সাধন-ভজন আজও নবদ্বীপের সমাজবাড়িতে চর্চিত হয়। এই সাধনপ্রণালীর মধ্যে দিয়েও পুরুষের রূপান্তরকামিতার একটি ভাব পরিলক্ষিত হয়, যেখানে তাঁরা নারীবেশে সজ্জিত হয়ে, ঈশ্বররূপী পুরুষকে কামনা করেন।

উপসংহার

সমান্তরাল যৌনতার অন্তর্গত রূপান্তরকামী এবং সমকামী মনস্কতার একটি আবছায়া ভাব সখীভেকি প্রণালীর মধ্য দিয়েও বৈষ্ণব ভদ্রসমাজে প্রবাহিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ফলত বলা যায়, চৈতন্যের দিব্য জীবনে যেমন সমান্তরাল যৌনতার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে, তেমনি চৈতন্যের অধ্যাত্ম সাধনায় এবং পরবর্তীকালে সেই সাধনার ধারা বিভিন্ন শাখা

প্রশাখায় প্রবাহিত হলেও, তারমধ্যে সমান্তরাল যৌনতার বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা গেছে।

তথ্যসূত্র:

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা ৯, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৫৫, পৃ. ৩৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *বৈষ্ণবপদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৬, পৃ. ১৩৬
৫. উত্তম দাস, *একালের মঙ্গলকাব্য*, মহাদিগন্ত, কলকাতা ১৪৪, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৫৪
৬. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনার তরী, কলকাতা ৫৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ৫৯
৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা ৯, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৫৫, পৃ. ৫৮৭
৮. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), *বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২১৩
৯. শ্রীমন্তকিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ (সম্পা.), *লোচনদাস বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*, গৌড়ীয় মঠ, কলকাতা ৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৩
১০. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), *বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২১৯
১১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার

(সম্পা.), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা ৯, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৫৫, পৃ. ৫৪৭

১২. প্রাপ্ত, পৃ. ৮৮

১৩. শ্রীমদ্ভক্তিকেবল উড়ুলোমি মহারাজ (সম্পা.), লোচনদাস বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, গৌড়ীয় মঠ, কলকাতা ৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ. ৯৯

১৪. প্রাপ্ত, পৃ. ৯৮

১৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পা.), জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ২২৬

১৬. ভাস্কর চৌধুরী, বিকল্প যৌনতা ও বাংলা সাহিত্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৫৪, ২০১৫, পৃ. ১৩৬

১৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈষ্ণবপদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৬, পৃ. ২৮৬

১৮. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা, সোনার তরী, কলকাতা ৫৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ৬৪

১৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা ৯, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৫৫, পৃ. ২১১

মৌষলপর্বের ধ্বংসলীলার উপাখ্যান আধুনিক কবির মননে চিত্তনে

বীণা মণ্ডল

সারসংক্ষেপ

বীণা মণ্ডল
পিএইচডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail : binamondal91@gmail.com

মহাভারতের বিরাট বিস্তৃত কাহিনির মধ্যে নিহিত আছে ভারতবাসীর জাতীয় ঐতিহ্য। পৃথিবীর বৃহত্তম এই প্রাচীন মহাকাব্যের নানা কাহিনি বা মিথের ঐতিহ্য ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে বহন করে আসছে। আধুনিক কবি সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতকে পাথেয় করে কবিতা লিখতে গিয়ে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন মহাকাব্যিক অনুষ্ণ বা মিথকে। দুই ভিন্ন যুগ তথা সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে আধুনিক কবি সেই মিথকে কখনো সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো তাকে ভেঙে নির্মাণ করেছেন অন্য এক মিথ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি সামাজিক, রাজনৈতিক অভিঘাত বদলে দিয়েছে আধুনিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেই বদলে যাওয়া দৃষ্টির তীব্র আলোকে নিত্যনতুনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে ঐতিহ্যময় মহাকাব্যিক মিথের স্বর্ণময় পরিপ্রেক্ষিত। বিশ শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন কবির কবিতা বিশ্লেষণের সূত্র ধরে মৌষলপর্ব এর ধ্বংসলীলার এক প্রবহমান চিরন্তন প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হলো এই আলোচনায়।

মূলশব্দ

মহাকাব্য, মিথ, জাতীয় ঐতিহ্য, পুনর্নির্মাণ, যদুবংশ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অবক্ষয়

গবেষণা পদ্ধতি

মহাকাব্যিক মিথ কীভাবে আধুনিক সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা কবির একান্ত ব্যক্তিগত উচ্চারণের মধ্যদিয়ে ধ্বনিত হয়েছে, তা মহাকাব্যিক পরিপ্রেক্ষিত ও আধুনিক কবিতার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা এই আলোচনায় উপস্থাপন করা হলো।

ভূমিকা

আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণগুলি হল, মানবধর্ম, নাগরিকতা, ব্যক্তিস্বাভিত্ত্য, নৈরাশ্য, মূল্যবোধের সংশয় প্রভৃতি। যা আধুনিক কবিতায় বিভিন্ন বিষয় ভাবনা ও উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এই সকল লক্ষণগুলিকে মহাকাব্যিক নানা অনুষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে উপস্থাপন করেছেন

আধুনিক কবি তাঁর কবিতায়। তিনি পুরাণ বা মহাকাব্যের কথা বারবার আবৃত্তি করে যান না, সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত বা নিজস্ব ভাবনার অভিনব খাতে প্রবাহিত করেন এই মহাকাব্যের অনুষ্ণ তথা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাকে। যার মধ্যদিয়েই ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমসাময়িক কোনো পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসা রচনা হয়ে ওঠে কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারত এমন এক মহাকাব্য যার মধ্যে নিহিত আছে ভারতীয় সমাজ ও জনজীবনের সকল দিকের প্রতিচ্ছবি। এই মহাকাব্যের কাহিনিকে কোনো একটি বিশেষ কালসীমায় বাঁধা যায় না। যুগে যুগে তার আবেদন নতুন থেকে নতুনতর হয়ে উঠে এসেছে ভারতবাসী তথা মানবজাতির জীবনে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর মহাভারতের কথা গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন -

“...মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান।”^১

এই প্রবহমানতার ধারাপথ বেয়ে মহাভারতের নানা চরিত্র ও ঘটনার মিথ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিশে গিয়েছে ভারতবাসীর জনজীবনের সঙ্গে। আর কালক্রমে তা পরোক্ষভাবে হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ভারতবাসীর জীবনধারা, জীবিকা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সংস্কার ও মূল্যবোধকে।

মহাভারতের অন্যতম চরিত্র, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্ত্রক বাসুদেব কৃষ্ণ। মহাভারতের কৃষ্ণ দ্বাপরবাসী, প্রাজ্ঞ প্রাপ্ত বয়স্ক, যিনি রাজনীতিবিদ, যোদ্ধা, পরম জ্ঞানী পুরুষ হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছেন, যার সুচারু নির্দেশনায় কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে আঠারো দিনের অবিশ্রান্ত রক্তপাত ও মৃত্যুমিছিলের বিনিময়ে পাণ্ডবদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মরাজ্য। চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়ের শাসন, বিরাজ করছে

শান্তি, কিন্তু সেই কাক্ষিত পরম শান্তি ও সমৃদ্ধির মাঝেই বেজে উঠেছে আর এক ধ্বংসের দামামা। যা মহাভারতের মৌষলপর্ব এ বর্ণিত হয়েছে। এই পর্বের তাৎপর্যবাহী ঘটনাগুলির এক একটি চরম মুহূর্ত আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতকে পাথেয় করে নবরূপে উপস্থাপিত হয়েছে আধুনিক কবিদের কবিতায়।

বিশ্লেষণ

(১)

মহাভারতের মৌষলপর্বের মূল ঘটনা যদুবংশের ধ্বংস এবং কৃষ্ণের দেহত্যাগ। এছাড়াও এই পর্বে বর্ণিত হয়েছে যদুবংশীয় যুবকদের নীতিজ্ঞানশূন্য অবক্ষয়ী আচরণ, স্বয়ং কৃষ্ণকে অমান্য, পরস্পরকে আক্রমণ ও হত্যা, বলরামের স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ, দ্বারকানগরীর ধ্বংস, বীর অর্জুনের বীরত্বের অবক্ষয়ের লক্ষণ, আর সকল ঘটনার মধ্যদিয়েই অবশ্যজ্ঞাবী যুগাবসানে বার্তা পৌঁছায় সম্রাট যুধিষ্ঠিরের কাছে, যার ফল স্বরূপ দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান। মহাভারতের যুদ্ধের বিরাট অবক্ষয়ের পর, আকস্মিক কিন্তু তীব্র এই ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে যুগাবসানের করুণ নিনাদ।

মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার মতো এই পর্বের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আধ্যাত্মিক, অলৌকিক নানা অনুষ্ণ উপস্থাপন করেছেন। তবে আধুনিক সাহিত্যের প্রধান শর্তই চরমবাস্তবধর্মিতা আর আধুনিক কবি অবশ্যজ্ঞাবীভাবে এইসকল আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করে কাহিনি নিঃসৃত চরম সত্যকে তুলে এনেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

(২)

সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, পরমজ্ঞানী বাসুদেব এবং তাঁর বীর সমৃদ্ধ যাদবকুলও যে যুগের অলঙ্ঘ্য নিয়মকে অতিক্রম করতে না পেরে কালের রথের চাকায় পিষ্ট

হলেন, আর বীর অর্জুন আপন অজ্ঞাতেই হারিয়ে ফেললেন তাঁর অর্জিত ক্ষমতা, যা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে শুধু অবিশ্বাস্যই নয় অকল্পনীয়ও বটে। এই মিথকে পাথয়ে করেই রচিত হয়েছে বিষ্ণু দে'র 'পদধ্বনি' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাল' কবিতা।

বিষ্ণু দে'র 'পূর্বলেখ' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থের 'পদধ্বনি' কবিতায় মহাভারতের এই কাহিনি সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিতে উঠে এসেছে। যখন যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে, কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন, যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন অর্জুন শুনছেন অনাগত কালের পদধ্বনি। তাদের বীরত্বের শাসনের কাল যে শেষ হয়েছে, ক্ষমতা আর বৈভব যে কালের নিয়মে আপনি সমর্পিত হচ্ছে উত্তর পুরুষের হাতে, তা উপলব্ধি করেছেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। এমনই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অর্জুন তাঁর হৃদয় ভাব ব্যক্ত করছেন সুভদ্রার কাছে। যে সুভদ্রা অর্জুনের বহুপত্নীর একটি পত্নী মাত্র হলেও তার অন্যতম পরিচয় তিনি অভিমুখ্য জননী, সর্বোপরি কৃষ্ণ ভগিনী। সেই সুভদ্রার কাছেই অর্জুন তার অতীত স্মৃতির ডালা মেলে ধরেছেন। তিনি জানেন একমাত্র সুভদ্রাকেই রাজনৈতিক জটিলতা ও শর্ত মুক্ত এক হৃদয়াবেগের সম্পর্ক দ্বারা তিনি লাভ করেছেন, তাইতো তিনি বলেছেন -

“হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার
বার বার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতবার যত ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্ধৃত সে তোমার
লীলার।”^২

সেই সুভদ্রাকে সামনে রেখেই অর্জুন তাঁর অতীত গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বের কথা যেমন তুলে ধরেছেন,

তেনমই ব্যক্ত করেছেন তাঁর পরাজয়, অক্ষমতা আর যন্ত্রণার কথাও।

মৌষলপর্ব এ দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ, সমস্ত যাদব বীররা শান্তির রাজ্যে অনন্ত বিশ্রাম আর বিলাসের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। এমনই সময় বিশ্বমিত্র, কর্ণ প্রমুখ মুনির আগমন ঘটে দ্বারকায়। যদুবংশীয় যুবকরা তাঁদের সঙ্গে স্থূল উপহাসের কারণেই কৃষ্ণ পুত্র শাম্বকে বক্রণ গর্ভবতী স্ত্রী রূপে পেশ করে তার ভবিষ্যৎ জানতে চায়। আর সর্বজ্ঞ মুনিদের ত্রুদ্র অভিশাপের ফল স্বরূপ শাম্ব এক মুষল প্রসব করে, যা প্রত্যক্ষভাবে যদুবংশ ধ্বংসের কারণ। উগ্রসেনের সচেষ্ট তৎপরতায় সেই মুষল চূর্ণ করে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়, আর যাদবকুলে সুরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কর্মহীন, ভোগপিপাসু যাদব যুবকরা তা অস্বীকার করে প্রবাসে যায় এবং সুরাপান ও স্বেচ্ছাচারের এক প্রলয়মুখী তীব্রতায় মেতে ওঠে। তারা একে অপরকে আকস্মিকভাবেই আক্রমণ করে ও সেই মুষলের আঘাতে নিহত হতে থাকে। সেখানে উপস্থিত কৃষ্ণ এই অবক্ষয় ও ধ্বংস রক্ষার চেষ্টা না করে নিজেও যুক্ত হন সেই বিধ্বংসী খেলায় এবং অর্জুনের কাছে এই পরিণতির বার্তা পাঠান। শেষে দূরে বনপ্রান্তরে গিয়ে এক তুচ্ছ নিষাদ জরার তীরে দেহত্যাগ করেন। অর্জুন বসুদেবের কাছে সকল পরিণতি শুনে কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অবশিষ্ট অসহায় দ্বারকাবাসীদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাওয়ার সময় আভীর দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তে তিনি ভুলে যান তাঁর গাণ্ডীব ব্যবহার, এই প্রথম বীর অর্জুন অক্ষম প্রমাণিত হন তাঁর অর্জিত শক্তি প্রদর্শনে, অর্জুনের সেই অনুভবই উঠে এসেছে এই কবিতায় -

“উর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদব যুবাদল
অতীত-অর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রাক্ষ বিকল।

হায়, কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থ সারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা
মাথা কোটে।”^৩

এভাবেই নিজের ব্যর্থতা ও পরমসখা কৃষ্ণের মৃত্যুতে ব্যথিত অর্জুন কৃষ্ণ ভগিনীর কাছেই সেই স্মৃতিচারণ করছেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহাপ্রস্থানের। অর্থাৎ যুগের নিয়মে পথ ছেড়ে দিতে হবে তাঁদের। আগত যুগের সেই পদধ্বনি শুনছেন অর্জুন কিন্তু সেই অবিসম্ভাবী আহ্বানকে মেনে নিতে তাঁর যন্ত্রণার কথাই উঠে এসেছে এই কবিতার উচ্চারণে।

বিষ্ণু দে মহাভারতের এই অনুষ্ঙ্গকে তিরিশের বাঙলাদেশের সমাজচেতনা ও সমসাময়িক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন। এই দশকেই বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত, সাধারণ শ্রেণি পরিচিত হচ্ছে মার্কসবাদের সঙ্গে। বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে শ্রেণিবিন্যাসহীন এক সমাজ পরিবর্তনের বার্তা ভাসছে তিরিশের আকাশে বাতাসে। যার ফলে সাধারণ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ক্ষমতাদখলের এক বিদ্রোহ যেমন তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণির কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে কালের অবশ্যম্ভাবী বিদায় বাণী। বুর্জোয়া আধিপত্য থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের লড়াইয়ের সেই অমোঘ বার্তাকেই বিষ্ণু দে মহাকাব্যিক মিথের মোড়কে উপস্থাপন করেছেন। এই কবিতায় আত্মীয় অনার্য দস্যুদের কাছে অর্জুনের পরাভব, বীর পঞ্চপাণ্ডবের রাজত্ব ত্যাগ, কৃষ্ণ-বলরামের দেহ ত্যাগের মধ্যে উত্তর প্রজন্মের উত্থান ও তাদের পথ ছেড়ে দেওয়ার বার্তাই উঠে এসেছে।

এই উপস্থাপনের মধ্যে একদিকে সমকালীন কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা মহাকাব্যের অমৃতধারার স্পর্শে হয়েছে কালোত্তীর্ণ, অন্যদিকে তেমনই দ্বাপর যুগের এই মহাকাব্যিক মিথ তার কাল সীমা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সর্বকালের ধ্বনি।

বিষ্ণু দে’র সমসাময়িক প্রবাদ প্রতীম কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘ক্রন্দসী’ কাব্যগ্রন্থের ‘কাল’ কবিতায় সাংকেতিকভাবে উঠে এসেছে মৌষলপর্বে শূদ্র নিষাদের তীরে কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা। ১৯৩২ সালে রচিত এই কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘কাল’ তথা ‘মহাকাল’কে সামনে রেখে প্রশ্ন করছেন - “কিছুই কি নেই অব্যাহতি?”^৪ অতীতের কোনো গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি বা নৃশংস কোনো হীনকর্ম, কিছুই অব্যাহতি নেই, কালের চলমান চাকায় নিষ্পেষিত হবে সবই। অতীতের কোনো কীর্তি স্তম্ভ আজ যেমন কালের পাকচক্রে শুধুই ভগ্নাবশেষ, তেমনই অতীতের গৌরবও আজ কাহিনি মাত্র। এই প্রসঙ্গেই কবি আশ্রয় নিয়েছেন মহাকাব্যিক মিথের। কৃষ্ণ যুগাবতার, তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে আছে পুরাণ ও মহাকাব্যের পাতায় পাতায়। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করে তিনি পারিজাত বনে যে অক্ষয়কীর্তি রেখে এসেছেন, তা আজ কালপ্রবাহে ভস্মাবশেষ মাত্র। অবশেষে সেই প্রাজ্ঞ কৃষ্ণের পরিণতি সম্পর্কে কবি বলেছেন-“শূদ্রের অলক্ষ্য ভেদে নিহত আমার ভগবান”^৫। তিরিশের বাঙলাদেশে যে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান উঠে এসেছে তা কালের নিয়মেই প্রচলিত সমাজ ভাবনা এবং তার যাবতীয় কীর্তি ও প্রতিষ্ঠাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। কালের এই প্রবাহ থেকে নিষ্কৃতি নেই কারো, স্বয়ং যুগশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও রেহাই পাননি। আধুনিক কবি নানাভাবে সেই কাল বা মহাকালের কাছে মিনতি জানিয়ে তাঁর প্রশ্ন রেখেছেন, জানতে চেয়েছেন তার এই গতির কারণ কী? আর কী কারণেই বা কালের

চাকায় নিষ্পেষিত হবে জেনেও মানব জাতি তার নশ্বর সভ্যতার গুটি সাজায়? সবই তো ভেসে যাবে কালস্রোতে। কিন্তু এর পরই কবি বুঝেছেন—

“মিছে চাওয়া, মিছে এ মিনতি,

তোমার সংহার হতে নেই কারো অব্যাহতি।”৬

কাল প্রবাহের এই অমোঘ সত্যতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে সমসাময়িক যুগপরিপ্রেক্ষিত আর মহাকাব্যিক অনুষঙ্গের অভিঘাত। আর এখানেই মৌষলপর্বের কাহিনি আধুনিক বিশ্লেষণে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

কবিতার পাশাপাশি এই ঘটনার অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে রচিত দুটি নাটকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর পৌরাণিক নাটক ‘যদুবংশ’(১৮৮৩) তে এই কাহিনি তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণ নিজ বংশীয়দের প্রভাসে যাওয়ার প্রস্তাব দেন এবং সুরাসক্ত যাদবদের অনর্থক কলহকে নিবারণ করেন নি, আর অন্যদিকে বলরাম তা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন ও ব্যর্থ হন। এখানে নাট্যকার নিছকই ভক্তিরস পরিবেশন করেছেন, আধুনিক কেনো দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করতে তিনি পারেন নি। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকে যদুবংশ ধ্বংসের অবশ্যম্ভাবী ঘটনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। মানব ইতিহাসের ঘূর্ণমান কালের চাকার আদি সত্যকে এই মহাকাব্যিক মিথের মোড়কে উপস্থাপন করেছেন তিরিশের এই কবি।

বিশ শতকের প্রথম ভাগের বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, যুগচেতনা, যুগযন্ত্রণা প্রভৃতির বৃত্ত থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসাকে এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের দর্পণে ফেলে দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা। সেই কারণে তাঁরা কখনও মিথের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন, কখনও বা প্রয়োজন মতো নবজন্ম ঘটিয়েছেন মিথ পুরাণের।

(৩)

যদুবংশ তথা যাদবকুল কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা - অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি প্রভৃতি। এই সকল শাখার বীরেরাই উপস্থিত ছিলেন প্রভাসে। অথও অবসর ও অবসাদ দূর করে আনন্দ উপভোগের বিকৃত ইচ্ছায় তারা একত্রিত হয়ে অপরিমিত সুরা পান করতে থাকেন। সেখানে উপস্থিত কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার মধ্যেই নিহিত ছিল তাদের অবক্ষয়ের বার্তা। সেখানে উপস্থিত সাত্যকি, কৃতবর্মা, বভ্রু, গদ সুরাপান করতে করতে অত্যন্ত মত্ত হয়ে, নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক পূর্বকৃত ঘটনার উল্লেখ করে একে অপরকে আক্রমণ করতে থাকে। এই বীরগণ পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিপরীতে যুদ্ধ করেছে কুরুক্ষেত্রে প্রান্তরে। সেই যুদ্ধে পরস্পরের দ্বারা সংঘটিত ন্যায় অন্যায়ের প্রসঙ্গ উঠে আসে এখানে। যেমন, যুদ্ধ শেষে দ্রৌপদীর নিদ্রাচ্ছন্ন পুত্রদের অশ্বখমা যখন হত্যা করে, তখন কৃতবর্মা তাকে পাহারা দিয়ে সাহায্য করেছে, যা অত্যন্ত অন্যায় বলে অভিযোগ জানান দ্রুদ্র সাত্যকি। আবার অন্যদিকে অন্যায় ভাবে ছিন্দ্‌বাহু ভূরিশ্রবাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেছেন সাত্যকি, যার তীব্র নিন্দা করেছেন কৃতবর্মা। প্রত্যুত্তরে সাত্যকি, সত্যভামার পিতা সাত্রাজিৎ বধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, কৃতবর্মার প্ররোচনাতেই শতবন্দা যে সাত্রাজিৎকে বধ করেছিল, তা উত্থাপন করেন। এরপরই ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয় যুবকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে আক্রমণ করেন ও হত্যা করেন। সাত্যকি প্রথম কৃতবর্মার শিরোচ্ছেদ করে এই হত্যালীলার সূচনা করেন। কৃষ্ণের সারথি ও স্নেহভাজন বীর সাত্যকি অর্জুনের কাছে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সাত্যকি যে ধ্বংসলীলা শুরু করেন স্বয়ং কৃষ্ণ ‘এরকা’ অর্থাৎ সবুজ ঘাস উত্তোলন করে মুঘল লাভের পথ দেখিয়ে সেই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেন।

মৌষলপর্বের এই অনুষঙ্গকে পঞ্চাশের কবি শঙ্খ ঘোষ ব্যবহার করেছেন তাঁর ‘যাদব’ কবিতায়। এই কবিতাটি ‘আদিম লতাগুলুময়’ কাব্যগ্রন্থের ‘দল’ বিভাগের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে এবং এই কবিতাগুলি লেখা হয় ১৯৭০-১৯৭১ সালে। সত্তরের বাঙালার নকশাল আন্দোলনের পটভূমি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বার বার উঠে এসেছে। মুক্তির দশকের স্বপ্ন দেখা আন্দোলনকারী যুবকরা বার বার আঘাত হানতে চেয়েছে শাসনযন্ত্রের শক্ত প্রাচীরে। যদিও তাদের মধ্যেই ছিল মতাদর্শ ও কর্মপন্থার ভেদাভেদ। দল বিভাজনের সরলরেখা দুর্বল করতে চেয়েছে তাদের আন্দোলনের শক্তিকে। এই যুবকদের মধ্যেই তিনি সাত্যকিকে দেখেছেন। আর এই কবিতায় কবির লক্ষ্য তার উপরেই স্থির হয়েছে। মহাভারতের সাত্যকি সুরাসক্ত হয়ে নিজ বংশীয় যুবকদেরই পূর্বকৃত অপরাধের প্রসঙ্গ তুলে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, আর গুরু করেছিলেন যাদবকুলের ধ্বংসলীলা। আর আজকের সাত্যকিকেও কবি তেমনই আহ্বান করেছেন সেই রীতিহীন খেলা গুরু করার। এই সাত্যকি অস্ত্র ধারণ করবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। যাদের দীর্ঘ দিনের অপমান ভারাক্রান্ত করেছে তাদের জীবনকে। সেই শক্তির বিরুদ্ধে গুরু হবে তাদের ধ্বংসাত্মক খেলা। কৃষ্ণ সারথি যে হত্যা ও ধ্বংসলীলা গুরু করেছিল তা ক্রমে ত্বরান্বিত করেছিল সমগ্র যাদবকুলের বিনাশকে আর সেইসঙ্গে পাণ্ডবদের রাজত্ব ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথ বেছে নেওয়াকে। তাইতো কবি আজকের সাত্যকিকে বলছেন—

“এইবার সময় সাত্যকি

সব শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত যাদব বংশ,

যে-কোনো সবুজ ঘাস

হাতে নিলে হয়ে ওঠে মুঘল মুদগর ধ্বংসবীজ

এইবার সময় সাত্যকি”^৭

যদিও মহাভারতের সাত্যকি ‘এরকা’ থেকে মুঘল উদগারের আগেই পারম্পরিক আঘাতে নিহত হয়েছিল। কিন্তু কবি আজকের সাত্যকিকে বলছেন মুঘল তুলে নিয়ে একবার এই মত্ত সমাজ ও শাসনতন্ত্রকে আঘাত করতে, আর এই মত্ত রীতিহীন খেলা নিশ্চয়ই আবারও প্রবাহিত হবে অনেকদূর, আর একবার ঘটাবে প্রচলিত শাসনের অবসান। এভাবেই মৌষলপর্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সেই মিথকে ভেঙ্গে এক নতুন মিথ ও ধ্বংসলীলা উত্থানের কাহিনি তৈরি করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। যা এই মহাকাব্যিক মিথকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দান করেছে।

নবনীতা দেবসেনের ‘যদুবংশ পালা’ কবিতায় এক গভীর ব্যঞ্জনা যদুবংশ ধ্বংসের শেষপর্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের দেহত্যাগের অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। ‘রক্তে আমি রাজপুত্র’ ১৯৭২-১৯৮৮ পর্বের কবিতা এটি। এই পর্বের পূর্ববর্তী অনেকগুলি কবিতায় বিচ্ছিন্নতা, মৃত্যু, ধ্বংসলীলার পরিপ্রেক্ষিত উঠে এসেছে। এই কবিতাটির মধ্যে একটি যাত্রাপালা আরম্ভের বাতাবরণ তৈরি করেছেন কবি। সেই যাত্রাপালার দর্শকদের তিনি সতর্ক করেছেন, সজাগ করেছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সবরকম সজ্জার মধ্যদিয়ে। সেই পালার মুখ্যদৃশ্য কৃষ্ণের দেহত্যাগ। আমরা জানি যদুবংশের ধ্বংসলীলা গুরু হয়েছে যাদব যুবকদের অবক্ষয় ও পরস্পরের হত্যার মধ্যদিয়ে। প্রভাসে ঘটে যাওয়া এই ধ্বংসলীলার পরেও অবশিষ্ট যাদবসহ সকলের কাছে বিস্ময়ের অনেক বাকি ছিল। কারণ তখনও যুগপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পরিণতি ছিল তাদের অজ্ঞাত। এই কবিতায় কবি নবনীতা দেবসেন দর্শকবৃন্দকে আহ্বান জানাচ্ছেন—

“...আসন গ্রহণ করণ, আলো এবার নিবছে।

সাজসজ্জা প্রস্তুত, মঞ্চসজ্জা শেষ, আসবাবপত্র

অপেক্ষমাণ, অভিনেতাদের প্রবেশ ঘটবে,

বাঁশি বেজেছে, পাদপ্রদীপ জ্বলেছে, ঘর
অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে।”^৮

সেই মন্ত যাদব বীরগণ যখন একে অপরকে আক্রমণ করতে ব্যস্ত তখন যে দূরে বনপ্রান্তে কৃষ্ণ নিজের জীবনের অস্তিমলীলার সম্মুখীন, তা তাদের সম্পূর্ণই অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু আজকের মানবজাতিকে সেই ধ্বংসলীলার অস্তিম মুহূর্তের সামনে দাঁড় করানোর আগে কবি নানাভাবে তাদের সচেতন করছেন।

মহাভারতের প্রধান পুরুষ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্ত্রক, কংসকে হত্যা করে পৃথিবীর ভার লাঘবকারী কৃষ্ণ অবক্ষয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া যাদবকুলকে রক্ষার চেষ্টা না করে বনপ্রান্তে জরা নামে এক নিষাদের তীরে মৃত্যু বরণ করেন। এই কবিতায় কবি যাদের সচেতন করছেন তারা আসলে যুগের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া অবক্ষয়িত জাতি, যাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় দ্বারকার সেই আত্মবিস্মৃত যুবকদের। যাদের সচেতন করার ভঙ্গিতে কবি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন সেই মুহূর্তের কথা যখন - “যাদবের পাদপদ্মে লক্ষ্যস্থির করেছে/ নিষাদ।”^৯ অর্থাৎ সেই চরম ধ্বংস অত্যন্ত নিকটে। নিষাদের লক্ষ্য সফল হয়েছিল, কারণ কৃষ্ণ এই ধ্বংস সম্পর্কে অবহিত থেকে সম্পূর্ণ অসচেতন ছিলেন। কৃষ্ণ অবিদ্যমান কিন্তু আজকের নশ্বর মানবজাতি তার অজ্ঞতার কারণেই অসচেতন, সেই কারণেই কবির দর্শককে সচেতন করার এই বাক্যবন্ধ আসলে পাঠক তথা জাতির কাছে অবশ্যম্ভাবী পতনের আগের সতর্ক বাণী হয়ে উঠে এসেছে। যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুর মিথকে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি এখানে শুধু অবক্ষয়, ধ্বংস ও অবশ্যম্ভাবী পতনকেই ইঙ্গিত করছেন না, সমগ্র জাতিকে সতর্কও করছেন। আর এভাবেই এই কবিতায় মৌলমপর্বের মিথের পুনর্নির্মাণে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

উপসংহার

“আমি ভারতবর্ষকে চিনতে চিনতে মহাভারতকে বুঝেছি। আমি মহাভারত পড়তে পড়তে ভারতবর্ষকে চিনেছি।”^{১০} নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর এই মন্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি মহাভারতের কাহিনির শিকড় ভারতবাসীর জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে। আর সেখানেই ভারতবর্ষ আর মহাভারত অবিচ্ছিন্ন এক যোগসূত্রে বাঁধা পড়েছে। আধুনিক কবিদের কবিতায় সেই পুরাণ ব্যবহারের অত্যাধুনিক প্রয়োগ কৌশল আসলে প্রতি মুহূর্তে পাঠকের কাছে মহাভারত পাঠের দৃষ্টিভঙ্গিকেই বদলে দেয়। আধুনিক কবি তাঁর কবিতায় মহাকাব্যের মিথকে কোন্ উদ্দেশ্যে বা কেন ব্যবহার করেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ‘পুরাণ ঐতিহ্য ও বিষ্ণুদে’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

“সমকালীন মানব সমাজ ও সভ্যতার প্রাণবীজ সন্ধানের জন্য তাঁরা আবহমান মানবকল্পিত মিথের প্রেরণা অবলম্বন করেন।”^{১১}

একথা রবীন্দ্রোত্তর সকল কবির ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিরা তাঁদের সমসাময়িক উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। অনিবার্যভাবেই সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত যেমন স্থান পেয়েছে তাঁদের কবিতায়, তেমনই সেই ঘটনাকে আবহমান মানবসমাজের প্রচারিত ও প্রচলিত মিথের সঙ্গে যুক্ত করে মানবসভ্যতার প্রবহমানতাকে একই সূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন তাঁরা। মহাকাব্যিক কাহিনির মোহনীয় মিথের সঙ্গে তুলনা বা সংযোগ সাধনই কেবল এই কবিদের উদ্দেশ্য নয়। একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক আবহকে বর্জন করে তাৎপর্যবাহী মূল ঘটনাকে তাঁরা আধুনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যদিকে তাঁদের মননে প্রতিস্থাপিত সেই

মিথকে ভেঙে আধুনিক প্রেক্ষিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী নবরূপ দান করেছেন। এভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কবিদের দৃষ্টিতে মহাকাব্যিক কাহিনি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ত্যাগ করে চিরকালীন মানব সমাজের সামর্থ্য হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. বুদ্ধদেব বসু, ‘মহাভারতের কথা’, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৯ পৃ. ৩ (মুখবন্ধ)
২. বিষ্ণু দে, ‘পদধ্বনি’, বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত) ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’, প্রথম সিগনেট সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯, পৃঃ ২২৫
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭
৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ‘কাল’ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, প্রথম দে’জ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা জুলাই ১৯৭৬, পৃঃ ১১৩
৫. পূর্বোক্ত - পৃঃ ১১৪
৬. পূর্বোক্ত - পৃঃ ১১৫
৭. শঙ্খ ঘোষ, ‘যাদব’ কবিতাসংগ্রহ ১, প্রথম প্রকাশ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা পৌষ, ১৩৮৭, পৃঃ ২০৬
৮. নবনীতা দেবসেন, ‘যদুবংশ পালা’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ষষ্ঠ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং কলকাতা, অগ্রহায়ন ১৪২৬, পৃঃ ৭৮
৯. পূর্বোক্ত - পৃঃ ৭৮
১০. সূত্র - <http://eisomoy.indiatimes.com> update - 13 August, 2017 10:55 :00 am
১১. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘পুরাণ - ঐতিহ্য ও বিষ্ণু দে’ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, জুলাই ১৯৯১, পৃঃ ৫০৮

গ্রন্থপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ :

১. কালিপ্রসন্ন সিংহ (অনুবাদ) মহাভারত, দ্বিতীয়খণ্ড, পঞ্চম প্রকাশ বেণীমাধব শীল’স লাইব্রেরী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ সন।
২. নবনীতা দেবসেন, ‘যদুবংশ পালা’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ষষ্ঠ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং কলকাতা, অগ্রহায়ন ১৪২৬,
৩. রাজশেখর বসু, মহাভারত, প্রথম মুদ্রণ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৬ সন।
৪. বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত) ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’, প্রথম সিগনেট সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯,
৫. শঙ্খ ঘোষ, ‘যাদব’ কবিতাসংগ্রহ ১, প্রথম প্রকাশ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা পৌষ, ১৩৮৭
৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, প্রথম দে’জ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ১৯৭৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অজিত কুমার ঘোষ, ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, প্রথম দে’জ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৫
২. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, জুলাই ১৯৯১
৩. বুদ্ধদেব বসু, ‘কালসন্ধ্যা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা (পি ডি এফ)
৪. বুদ্ধদেব বসু, ‘মহাভারতের কথা’, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৯
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়’, প্রথম প্রকাশ, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

লাবন্য কুমার সরকার

সারসংক্ষেপ

লাবন্য কুমার সরকার

পিএইচডি ফেলো

আইবিএস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

e-mail: labanya.soc@gmail.com

বর্তমানে সারাবিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এর নেতিবাচক প্রভাবও বাড়ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বেশি করে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের শিকার হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একাডেমিকভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে কিন্তু পাশাপাশি এর অতিরিক্ত ব্যবহার তাদের পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট করে এবং পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে; পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের দূরত্ব ব্যবহারকারীর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা তৈরি করার পাশাপাশি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন হ্রাসের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীদের রাত জাগার প্রবণতা বাড়ে এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়; মাথা ব্যথা, পিঠে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা হয়, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও শারীরিক ব্যায়াম না করায় শরীরে ক্লান্তি অনুভবসহ বদহজম ও ক্ষুধামন্দা তৈরি হয়। তারা মানসিকভাবে বিষণ্ণ ও ভিতরে ভিতরে অসুখী হয়ে ওঠে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিনে দিনে অস্থিরতা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ঈর্ষা, খিটখিটে মেজাজ, পরশীকাতরতা, একাকীত্বের অনুভূতি বাড়ছে, ইন্টারনেট ও ভিডিও গেমসে আসক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলশব্দ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থী, একাডেমিক সাফল্য, ফেসবুক আসক্তি, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব উন্মোচন করা। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের মোট ১২টি জেলার প্রধান ও পুরাতন সরকারি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎসের তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের প্রভাব উন্মোচন করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক প্রকার বিশেষায়িত ওয়েবসাইট যেখানে ব্যক্তি তার চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য, মন্তব্য, ছবি, ভিডিও, কার্টুন, কুইজ, গেমস ইত্যাদি শেয়ার করার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন। চ্যাটিং অপশানের সুবিধা নিয়ে ভার্চুয়াল বন্ধুর সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত থাকা সাপেক্ষে তার সঙ্গে চ্যাট করা ও দেখার সুযোগ পায়। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার করছে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে যুবসমাজ বিশেষ করে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেটযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে এটি ব্যবহার করছে। তারা সামাজিকভাবে একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকা, সরাসরি যোগাযোগ, দ্রুত তথ্য আদান প্রদান এবং অনলাইনে সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করে থাকে।^১ এসকল কাজে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষার্থীরা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সহ-পাঠ কার্যক্রমে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করছে। বাস্তব জগতের বন্ধুদের পরিবর্তে

অনলাইন বন্ধুদের বেশি গুরুত্ব প্রদান করছে। সামাজিক বা পারিবারিক কোনো আড্ডায় পার্শ্ববর্তী কারও প্রতি অমনোযোগী থাকা, ক্লাস চলাকালীন বা বাড়িতে পড়ার সময়, লাইব্রেরিতে, এমনকি পরীক্ষার আগের রাতেও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার পরিবর্তে ফেসবুক বা ইউটিউবে ভিডিও দেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।^২ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ফলে তাদের পড়ালেখা, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যে ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা বর্তমান প্রবন্ধে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা একটি উদ্ঘাটনমূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণাটিতে গুণাত্মক এবং সংখ্যাত্মক উভয় ধরনের তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই করা হয়েছে। গবেষণায় প্রথমে সারা বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ মনোনীত করা হয়েছে। দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা, এবং শিক্ষানগরী রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অনেক পুরাতন ও বিখ্যাত সরকারি কলেজ থাকায় উক্ত বিভাগত্রয়কে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে মোট ৪টি করে ১২টি সরকারি কলেজকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়। উক্ত নির্বাচিত কলেজগুলো থেকে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের মোট ৩৮০ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে সরল দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত এসপিএসএস ২৩ ভার্সন ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, স্বীকৃত জার্নাল, ম্যাগাজিন,

দৈনিক পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণ করে তা বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. বিশ্লেষণ

২০২০ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্বাচিত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালা জরিপের ভিত্তিতে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্য, পারিবারিক জীবন এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যেসব প্রভাব পড়ে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

৩.১ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্যের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্যের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের প্রভাবকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ইতিবাচক প্রভাব ও নেতিবাচক প্রভাব।

৩.১.১ ইতিবাচক প্রভাব

সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার উপর বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলে বা এটি ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকে যা সারণি ১-এ দেখানো হলো :

সারণি ১. শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক মাধ্যমের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

সামাজিক মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত একাডেমিক সুবিধা ও ইতিবাচক প্রভাব	গণসংখ্যা	শতকরা হার
--	----------	-----------

পরীক্ষার প্রস্তুতি, বাড়ির কাজ বা এসাইনমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা	৩৩৬	৮৮.৪০
শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থপুস্তকোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা	৩২৮	৮৬.৩০
শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন নতুন ধারণার সাথে পরিচয় ঘটা	৩৪৩	৯০.৩০
শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, ডকুমেন্টস, ক্লাস নোটস, ডিজিটাল কনটেন্টস, ক্লাস লেকচার, অনলাইন ক্লাসের ভিডিও প্রাপ্তি	৩৬৩	৯৫.৫০
কোর্স শিক্ষকদের সাথে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়	২০৬	৭৪.৪০
বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি	২৮৮	৭৫.৮০
ভর্তির নোটিশ, ক্লাস শিডিউল, পরীক্ষার নোটিশ, ফরম পূরণ নোটিশ, ক্লাস স্থগিতের নোটিশ সংগ্রহ	৩৩৮	৮৯.২০
শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি	১৯৮	৫২.১০
সামাজিক মাধ্যমে অন্যর সাফল্য দেখে পড়ালেখায় উদ্যম ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ	১৬৮	৬৩.৯০

উৎস: মার্চ জরিপ ২০২০

বি. দ্র: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিল।

সারণি ১ থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ৯৫.৫% শিক্ষার্থী মনে করে যে, সামাজিক মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, ডকুমেন্টস, ক্লাস নোটস, ডিজিটাল কনটেন্টস, ক্লাস লেকচার, অনলাইন ক্লাসের ভিডিও দেখতে পাওয়া যায়; ৯০.৩% শিক্ষার্থী মন্তব্য করে যে, এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন নতুন ধারণার সাথে পরিচয় ঘটে; ৮৯.২% শিক্ষার্থী ভর্তি নোটিশ, ক্লাস শিডিউল, পরীক্ষার নোটিশ, ফরম পূরণ

নোটিশ, ক্লাস স্থগিতের খবর ইত্যাদি বিষয় সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন শিক্ষামূলক পেজ থেকে পেয়ে থাকে; ৮৮.৪% শিক্ষার্থী পরীক্ষার প্রস্তুতি, বাড়ির কাজ বা বিভিন্ন ধরনের এসাইনমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এটি ব্যবহার করে থাকে; ৮৬.৩% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে তারা উক্ত মাধ্যমে শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রুপগুলোতে আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার সুযোগ পায়; ৭৫.৮% শিক্ষার্থী এটা থেকে বিস্ময়গত সম্পর্কে তথ্য পেয়ে থাকে; ৭৪.৪% শিক্ষার্থী মন্তব্য করে যে এর মাধ্যমে কোর্স শিক্ষকদের সাথে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়; ৫২.১% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করে; ৬৩.৯% শিক্ষার্থী সামাজিক মাধ্যমে অন্যের সাফল্য দেখে নিজেদের মধ্যে পড়ালেখার প্রতি উদ্যম ও অনুপ্রেরণা লাভ করে।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ৪৬.৫৮% শিক্ষার্থী জোরালো মত পোষণ করে যে, সামাজিক মাধ্যম একাডেমিক কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে সাহায্যে করে থাকে; বন্ধুদের সাথে সমন্বয় করার সুযোগ করে দেয় এবং শিক্ষার সাথে জড়িত নতুন নতুন শিক্ষণ ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে বেশ সহায়ক; ৪৫.৫৮% শিক্ষার্থী একমত পোষণ করে যে এর মাধ্যমে সহপাঠী এবং শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটায়; ৪৩.৮৪% শিক্ষার্থী মনে করে যে সামাজিক মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষকদের সাথে গ্রুপ আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়; ৪৪.৫৯% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে, ফ্যাকাণ্ডির বিভিন্ন ঘোষণা, নোটিশ, লেকচার ইত্যাদি পেতে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে গ্রহণ করা যায়; ৪১% শিক্ষার্থী মনে করে যে সামাজিক

মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে এসাইনমেন্ট সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য সহায়ক; ৩৯% শিক্ষার্থী একমত পোষণ করে যে, অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সাথে পড়ালেখা বিষয়ক গ্রুপ আলোচনার করার সুযোগ করে দেয় সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন সাইটগুলো।^{১০} বাংলাদেশের আইমান সাদিকের ‘Robi 10 Minute’s School’ এবং সালমান খানের ‘খান একাডেমি’ ওয়েবভিত্তিক শিক্ষামূলক সাইট এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা উক্ত সাইটদ্বয় থেকে ইউটিউবে গিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত ভিডিও দেখে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। বিদ্যালয়গুলোতে মান্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে ইন্টারনেটের সাহায্যে শিক্ষকগণ পাঠ পরিচালনা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা আপলোড করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষকের ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ পায়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অবস্থান না করেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভার্চুয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। উক্ত মাধ্যমে বিভিন্ন সফল ব্যক্তির সাফল্যের গল্প পড়ে, ভিডিও দেখে বা প্রশংসামূলক বক্তব্য শুনে শিক্ষার্থীরা উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি কিছু পেইজ ও ওয়েবসাইট আছে যেমন কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন যেখানে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের ক্লাস আপলোড করা হচ্ছে এবং ঘরে বসে শিক্ষার্থীরা উক্ত সুযোগ গ্রহণ করছে।

৩.১.২ নেতিবাচক প্রভাব

শিক্ষার্থীদের সামাজিক মাধ্যম অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে তাদের একাডেমিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পরবর্তী সারণিতে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সফলতার উপর যে সকল নেতিবাচক

প্রভাব ফেলছে তা সারণি ২-এ উল্লেখ করা হলো :

সারণি ২. শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পড়ালেখার উপর সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ

একাডেমিক পড়ালেখার উপর নেতিবাচক প্রভাব সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পড়ালেখার জন্য সময় কম পাওয়া	৩৭১	৯৭.৬০
পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট হওয়া ও পরীক্ষায় নেতিবাচক ফলাফল	৩৭৭	৯৯.২০
বাড়ির কাজে অবহেলা এবং সঠিক সময়ে তা জমা দানে ব্যর্থতা	৩২৮	৮৬.৩০
ক্লাসে যেতে অনীহা	২৭১	৭১.৩০
ক্লাসে অন্যমনস্ক থাকা	৩২৬	৮৫.৮০
পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	২৪২	৬৩.৭০
বানান ভুল, ব্যাকরণগত ভুল, শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং রোমান হরফে বাংলা লেখার পরিমাণ বৃদ্ধি	২৭৭	৭২.৯০
শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি	২০৮	৫৪.৭০
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ার প্রবণতা কমিয়ে দেয়া	১৬৬	৪৩.৭০

উৎস: মাঠ জরিপ ২০২০

বি. দ্র: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিল।

সারণি ২ থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ৯৯.২% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কারণে পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট ও পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে; ৯৭.৬% শিক্ষার্থী মনে করে যে এই মাধ্যমে ব্যস্ত থাকার জন্য তারা পড়ালেখার সময় কম পায়; ৮৬.৩% শিক্ষার্থী উল্লেখ

করে যে এই মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার কারণে তারা বাড়ির কাজে অবহেলা করে এবং সঠিক সময়ে তা জমা দিতে ব্যর্থ হয়; ৮৫.৮% শিক্ষার্থী মন্তব্য করে যে, উক্ত মাধ্যমে ব্যস্ত থাকার জন্য তারা ক্লাসে অন্যমনস্ক থাকে; ৭২.৯% শিক্ষার্থী মনে করে যে, সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের বানান ভুল, ব্যাকরণগত ভুল, ভুল বাক্য লিখন, শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং রোমান হরফে বাংলা লিখতে প্ররোচিত করে; ৭১.৩% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে, এতে আসক্তির কারণে তারা অনেক সময় ক্লাসে যেতে অনীহা প্রদর্শন করে; ৬৩.৭% শিক্ষার্থীর মতে এটি তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে; ৫৪.৭% শিক্ষার্থী মনে করে যে, এর অতিরিক্ত ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য পূরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে; ৪৩.৭% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে সামাজিক মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা দিনের সময়ের একটি বড় অংশ সামাজিক মাধ্যমে কাটায় এবং যার ফলে তারা সঠিক সময়ে বাড়ির কাজ জমা দিতে ব্যর্থ হয় এবং ক্লাসের পড়ালেখার প্রস্তুতিতে ঘাটতি দেখা দেয়; ৭১% শিক্ষক বিশ্বাস করেন যে, সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের বই পড়ার মনোযোগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; ৫৮% শিক্ষক মনে করেন যে, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্ল্যাং বা নোংরা ভাষা এবং শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহারের কারণে তাদের লেখার দক্ষতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে; ৫৯% শিক্ষক মনে করেন যে, সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের সরাসরি যোগাযোগ দক্ষতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে; ৪২% শিক্ষক উল্লেখ করেন, সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীর সমালোচনামূলক বা ক্রিটিক্যাল চিন্তা করার ক্ষেত্রে বাধা দেয় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে

সব সময় মাথা নীচু করে ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্মার্টফোনের বদৌলতে যে প্রজন্ম গড়ে উঠছে তাকে হেড ডাউন জেনারেশন বলা যায়।^৪

অনেক পিতামাতা অভিযোগ করে যে তাদের সন্তান লেখাপড়ার নাম করে রাত জেগে ফেসবুক বা ইউটিউব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে এবং ক্লাসে যেতে পারে না কিংবা ক্লাসে গেলেও মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। অনেক শিক্ষক অভিযোগ করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও অনেকে লুকিয়ে বা অনেক সময় ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মোবাইলে ব্যস্ত থাকার কারণে পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া মন্তব্য করার সময় গঠনমূলক, উৎসাহমূলক ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে অনেকেই অশ্লীল, উচ্ছাসমূলক শব্দ ব্যবহার করে। যে সময়টুকু তারা ফেসবুকে কিংবা অন্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় করছে, আগে সেই সময়ের বড় অংশই তারা পড়ালেখায় ব্যয় করত। পড়ার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার শতকরা ৮৯ ভাগ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ বিঘ্নিত করে।^৫ অন্য একটি প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায় যে, অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় যারা ফেসবুকে ভয়ভীতি ও হেনস্তার শিকার হয়, তাদের অ্যালকোহল ও মাদকে আসক্ত হওয়ার এবং স্কুল ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এছাড়া ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল খারাপ করার, আত্মসম্মান কমে যাওয়ার ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।^৬

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বাস্তব জীবনের অনেক পরিভাষা বা ট্রেন্ডি শব্দ এখন হরহামেশা ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষা সংক্ষেপিত হওয়ার পাশাপাশি মানবীয় সম্পর্কগুলোও সংক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসার পর থেকে রোমান হরফে অর্থাৎ বাংলা শব্দকে ইংরেজিতে লেখার প্রচলন বেড়ে গেছে। এই মাধ্যমে অশুদ্ধ বাক্য গঠন, ভুল বানান, ব্যাকরণের ভুল ব্যবহারের ছড়াছড়ি প্রায়ই লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই কারো জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে HBD, উচ্চস্বরে হাসতে LOL, অভিবাদন জানাতে Congratz এর মতো শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে। শিক্ষার্থীদের অনেকেই বাস্তব জীবনে এবং পরীক্ষার উত্তরপত্রে অনলাইনে ব্যবহৃত এই সমস্ত ভাষাগুলোর ভুল প্রয়োগও করছে। ফলে অনলাইনের ভাষা থেকে বাস্তবের ভাষার মধ্যে আসছে পরিবর্তন। আবির্ভাব ঘটছে এক মিশ্র প্রকৃতির ভাষা। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে বহুল ব্যবহৃত এরকম কিছু পরিভাষা হলো: OMG (Oh My God), HBD (Happy Birthday), LOL (Laughing Out Loudly), Congratz (Congratulation), ASM (Awesome), Bro (Brother), F9 (Fine), Gn8 (Good Night), Gr8 (Great), PP (Profile Picture).^৭

৩.২ শিক্ষার্থীদের পারিবারিক জীবনের উপর সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

সামাজিক মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর একাডেমিকের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। এর ব্যবহার তাদের দৈনন্দিন কাজের রুটিনেও ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। এর ব্যবহার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন শিথিল করে দিয়ে পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। সামাজিক মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক জীবনে যে ধরনের প্রভাব ফেলছে তা সারণি ৩-এ আলোচনা করা হলো:

সারণি ৩. শিক্ষার্থীদের পারিবারিক জীবনের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক সম্পর্কের উপর প্রভাব	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি	৩৪৩	৯১.০০
পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি	৩৫৪	৯৩.৯০
বন্ধুদের মধ্যে আড্ডার সুযোগ কমিয়ে দেয়া	৩৪৬	৯১.৮০
পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো সময় কাটাতে প্রতিবন্ধকতা	৩০৬	৮১.২০
ব্যবহারকারীর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা তৈরি	৩৩৪	৮৭.৯০
পারস্পরিক সংশ্লব কমিয়ে দেয়া	৩২২	৮৪.৭০
অসামাজিক এবং সমাজবিরোধী প্রবণতা তৈরি	২১৩	৫৬.১০
সরাসরি যোগাযোগ হ্রাস	২৮৯	৭৬.১০
পারিবারিক বন্ধন হ্রাস	৩৬৩	৯৫.৫০
খাবার গ্রহণের সময়, বাইরে বেড়াতে গিয়ে স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা	৩১২	৮২.১০
স্মার্টফোনে ব্যস্ততা পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে	২৭৫	৭২.৪০
সরাসরি যোগাযোগের অভাবে ভার্চুয়াল প্রণয় সম্পর্কে বিশ্বাসের ঘাটতি	৩৪৩	৯০.৭০
সামাজিকীকরণে বাধা তৈরি	২০৬	৫৪.২০

উৎস: মাঠ জরিপ ২০২০

বি. দ্র: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিল।

সারণি ৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৯৫.৫% শিক্ষার্থী মনে করে সামাজিক মাধ্যম পারিবারিক বন্ধন কমিয়ে দেয়; ৯৩.৯% শিক্ষার্থী মনে করে এটি পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি করে; ৯১.৮% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে

এর ব্যবহার পারিবারিক ও বন্ধুদের মধ্যে আড্ডার সুযোগ কমিয়ে দেয়; ৯১.০% শিক্ষার্থী মন্তব্য করে যে এটির ব্যবহার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে; ৯০.৭% শিক্ষার্থীর ধারণা হলো, সরাসরি যোগাযোগের অভাবে ভার্চুয়াল প্রণয় সম্পর্কে বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়; ৮৭.৯% শিক্ষার্থী মনে করে যে এর ব্যবহার তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা তৈরি করে; ৮৪.৭% শিক্ষার্থী মনে করে এটা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সংশ্লব কমিয়ে দেয়; ৮১.২% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে এটা পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো সময় কাটানোয় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে; ৮২.১% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে এর ব্যবহার খাবার গ্রহণের সময়, বাইরে বেড়াতে গিয়ে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি করে; ৭৬.১% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ কমিয়ে দেয়; ৭২.৪% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে সামাজিক মাধ্যমের কারণে স্মার্টফোনে ব্যস্ততা পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে; ৫৬.১% শিক্ষার্থী অসামাজিক এবং অনেক সময় সমাজবিরোধী প্রবণতা তৈরি করে; ৫৪.২% শিক্ষার্থী মনে করে যে এটা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণে বাধা তৈরি করে।

তাইওয়ানের শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত একটি গবেষণা হতে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ইন্টারনেট আসক্তি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ যেমন সময়মতো খাওয়া, ঘুম, পড়ালেখা, খেলাধুলা এবং বাইরে ঘুরতে যাওয়ার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইন্টারনেটের গতি, মোবাইল ফোনের ফোর জি বা ফাইভ জি নেটওয়ার্কের সুবিধা, স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা, বাসাবাড়িতে ওয়াই-ফাই সংযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বর্তমান প্রজন্ম খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম,

খেলাধুলা, কায়িক পরিশ্রম বাদ দিয়ে পূর্বের তুলনায় ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।^{১৮} ফেসবুক ও ইন্টারনেটের কারণে বাবা-মা এবং সন্তানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এবং ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়ার জন্য কম সময় ব্যয় করছে। পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সময় কাটানোর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইন্টারনেটে অতিরিক্ত সময় কাটানোর কারণে পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে গুণগত সময় কাটানোর ক্ষেত্রে খুবই কম সময় পায়।^{১৯}

ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যম সাইটগুলোতে ব্যয়কৃত সময় বয়ঃসন্ধিদের সাথে পরিবারের বর্তমান সম্পর্কে দুর্বল করে দিচ্ছে। সন্ধ্যার সময় এবং সপ্তাহান্তে পরিবারের সাথে সময় কাটানোর অভাবে দিন দিন সন্তানের সাথে অভিভাবক ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে দূরত্ব বাড়ছে। ব্যবহারকারীর উক্ত মাধ্যমে ব্যস্ত থাকার কারণে পরিবার ও অন্যদের সাথে মুখোমুখি সম্পর্কের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।^{২০} সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমানে পারিবারিক বন্ধন হ্রাসে, বহুগামিতা বৃদ্ধি, বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক তৈরি, স্বামী এবং স্ত্রীর অতিমাত্রায় ভার্চুয়াল জগতে বিচরণ, পরনারী বা পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। বিয়ে ভাঙার ক্ষেত্রে ফেসবুক বা মোবাইল কালচার বড় প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে ফেসবুক স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নানা ধরনের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফেসবুকে পরিচিত হয়ে অনেকে ভার্চুয়াল প্রণয়ে আসক্ত হয়ে বিয়ে করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীরা প্রতারণামূলক

সম্পর্কে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া এবং প্রেমের ফাঁদে পড়ে মেয়েদের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারানোর ঘটনা অহরহ ঘটছে।^{২১}

টাইম ম্যাগাজিনের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যে ২০০৯ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ ছিল সরাসরি ফেসবুকজনিত কারণে। অর্থাৎ ফেসবুকে তারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ফেলো করে, সঙ্গীর অগোচরে পাসওয়ার্ড জেনে ফেসবুক একাউন্ট খুলে দেখে; একপর্যায়ে অবিশ্বাস বা সন্দেহের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং কোর্টের মাধ্যমে তারা বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। আবার ২৫ শতাংশ সঙ্গী-সঙ্গিনী ফেসবুকে বা ইউটিউবে ভিডিও দেখা নিয়ে সপ্তাহে একদিন বাগড়া করে।^{২২}

৩.৩ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

এই গবেষণায় স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। এই দুই ধরনের স্বাস্থ্যের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৩.৩.১ শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট আসক্তির কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যের সাথে কথা কম বলা, স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকা, ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম অনুভব, সময়মতো খাবার গ্রহণ না করা, রাত জাগার অভ্যাস তৈরি হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের শরীরের উপর যে সকল ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা সারণি ৪-এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪. শিক্ষার্থীদের শরীরের উপর সামাজিক মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

শরীরের উপর নেতিবাচক প্রভাব	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ঘুমের ব্যাঘাত এবং রাত জাগার প্রবণতা বৃদ্ধি	৩৪২	৯০.০০
ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাস	১২২	৩২.১০
খাবার গ্রহণে অনীহা ও সময়মতো না খাওয়া	৩১৯	৮৩.৯০
মাথা ব্যথা, পিঠে ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা, হাতের আঙুলে ব্যথা অনুভব	২৭৮	৭৩.২০
শারীরিক পরিশ্রম ও শারীরিক ব্যায়াম না করা এবং দেহে ক্লান্তি অনুভব	২০৫	৫৩.৯০
বদ হজম ও ক্ষুধামন্দা অনুভব	২৩০	৬০.৫০
তৃষ্ণার্ত বোধ না করা এবং দীর্ঘক্ষণ পায়খানা বা প্রস্রাব আটকে রাখা	৮৩	২১.৮০
স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া	১৪৯	৩৯.২০

উৎস: মার্চ জরিপ ২০২০

বি. দ্র: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিল।

সারণি ৪ থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ৯০.০% শিক্ষার্থী উল্লেখ করেছে যে, সামাজিক মাধ্যম তাদের ঘুমের ব্যাঘাত এবং রাত জাগার প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে; ৮৩.৯% শিক্ষার্থী মনে করে যে এর ব্যবহার শিক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে খাবার গ্রহণে অনীহা বা সময়মতো না খাওয়ার প্রবণতা তৈরি করে; ৭৩.২% ছাত্রছাত্রী উল্লেখ করে যে সামাজিক মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার তাদের মাথা ব্যথা, পিঠে ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা, হাতের আঙুলে ব্যথা বাড়িয়ে দিয়েছে; ৬০.৫% শিক্ষার্থী মনে করে যে সামাজিক মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের জন্য তাদের বদ হজম ও

ক্ষুধা মন্দা তৈরি হয়; ৫৩.৯% শিক্ষার্থী ধারণা করে যে সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের শারীরিক পরিশ্রম ও শারীরিক ব্যায়াম না করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয় এবং এর ফলে তারা দেহে ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম অনুভব করে; ৩৯.২% শিক্ষার্থী মনে করে যে সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ক্ষেত্রে অবদান রাখে; ৩২.১% শিক্ষার্থী মনে করে যে স্মার্টফোনের আলো তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং নিয়মিত এয়ারফোনে উচ্চ শব্দে গান শোনা তাদের শ্রবণশক্তি হ্রাস করে; ২১.৮% শিক্ষার্থী সামাজিক মাধ্যমে ব্যস্ত থাকার কারণে পানি পানের কথা ভুলে যায় এবং অনেক সময় পায়খানা বা প্রস্রাব দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে।

একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ২৫.৯% জরিপে অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করে যে সামাজিক মাধ্যম তাদের চোখের সমস্যার জন্য দায়ী; ৮% অংশগ্রহণকারী মন্তব্য করে যে সামাজিক মাধ্যম তাদের পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী; ৫% অংশগ্রহণকারী মাথাব্যথার উল্লেখ করেন; ২.৪% অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে, অতিরিক্ত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কারণে তারা মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ২.৪% অংশগ্রহণকারী এক ধরনের মানসিক চাপ অনুভব করে।^{১০}

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে ১২৬ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৪% সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কারণে মাথাব্যথা/ পিঠে ব্যথা/ চোখে ব্যথা/ হাতে ব্যথা সমস্যায় ভোগে ২৫% শিক্ষার্থী উচ্চ রক্তচাপে এবং ২১% শিক্ষার্থী হজম ও পাকস্থলীর সমস্যা অনুভব করে।^{১১}

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথ। নিয়মিত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে এমন ১৪-২৪ বছর বয়সী ১৫০০ তরুণ এতে

অংশ নেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের আগে যেসব শিশু-কিশোর স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ট্যাব বা ল্যাপটপে বেশি সময় কাটায়, তাদের মনোযোগ ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় হ্রাসের পাশাপাশি তাদের চোখের সমস্যা, ঘুমের ঘাটতি, মাথা ব্যথা, ক্লান্তিবোধ অনেকগুণ বেড়ে গেছে এবং একটানা একই জায়গায় বসে ফেসবুকে সময় কাটানোর কারণে ব্যবহারকারীর দেহে ক্ষতিকর চর্বি জমতে থাকে এবং ওবেসিটি বা স্থূলতায় ভোগার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।^{১৫}

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, রাতে ঘুমানোর সময় যারা স্মার্টফোন বালিশের নীচে রাখে তারা স্মার্টফোনের র‍্যাডিয়েশন দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৫ মিনিট একটানা মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্ক ও কান সংলগ্ন ত্বক গরম হয়ে যায় যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়াও মোবাইল ফোন চার্জ অবস্থায় অনলাইনে ভিডিও কলের সময় ব্যবহারকারী দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়।^{১৬} ম্যাসাচুসেটস-এর চোখ-কান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্মার্টফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিজনিত সমস্যা এবং মাথাব্যথা, ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।^{১৭} অন্য একটি গবেষণায় লক্ষ করা যায় যে, সামাজিক মাধ্যমে বুদ্ধি হয়ে থাকার কারণে ব্যবহারকারীর মধ্যে হাঁটাচলা, দৌড়ানোর মতো শারীরিক সক্ষমতা কমে যাওয়ায় মাথাব্যথা, অনিদ্রা, অবসাদ, বমি বমি ভাব, চোখজ্বালা পোড়া, ঘাড় বা পিঠে ব্যথা, হাতের ও হাঁটুর গিটগুলোতে ব্যথা অনুভব করা, মাথা জ্যাম ধরে থাকা ইত্যাদি উপসর্গ প্রায়শ লক্ষ করা যায়।^{১৮} দ্য স্পাইনাল জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে ঘাড়ে ক্রমাগত একজন ব্যক্তির মাথার ওজনের প্রায় ছয়গুণ চাপ পড়ায় আসক্তরা আক্রান্ত হচ্ছে ‘টেক্সট

নেক’ নামক ঘাড় ব্যথায়।^{১৯} অন্য একটি গবেষণা প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় যে, ফেসবুক ব্যবহারে এত বেশি মগ্ন থাকে যে ব্যবহারকারী পায়খানা বা প্রস্তাব দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে বা খাবার গ্রহণের কথা ভুলে যায় ফলে তাদের শরীরের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।^{২০}

৩.৩.২ মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের যেমন একঘেয়েমী দূর হয়, তারা অনলাইনে নিজের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারে; তাদের দুশ্চিন্তা দূর হয়, মানসিক সমর্থন বৃদ্ধি পায়; আনন্দ পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, আত্মবোধ, ব্যক্তিত্ব, ও আত্মপরিচয় নির্মিত হয়। পরিমিত মাত্রায় ফেসবুকের ব্যবহার মানুষের ব্রেনের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক কৌতুক, অনেক মজার ঘটনা পড়ে বা হাস্যকর ভিডিও দেখা যায় যা ব্যবহারকারীর শরীর ও মনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে অতিরিক্ত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করার কারণে শিক্ষার্থীদের মন খারাপ হওয়া, হতাশা বোধ করা, আবেগপ্রবণ হওয়া, ঈর্ষাবোধ, পরশীকাতরতা, অস্থিরতা, মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মতো বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয় যা সারণি ৫-এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৫. শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিষণ্ণ থাকা ও নিজেকে অসুখী মনে করা	৩১৮	৮৩.৭০
অস্থিরতা ও মানসিক চাপ অনুভব করা	৩১৮	৮৩.৭০

হতাশ হয়ে পড়া	১২২	৩২.১০
ঈর্ষান্বিত বোধ করা	৩১৬	৮৩.২০
পরশ্রীকাতর হওয়া বা অন্যের ভালো না চাওয়া	১৯২	৫০.৫০
আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া	১৯০	৫০.০০
একাকীত্ব অনুভব করা	৩৫৪	৯৩.২০
ভার্চুয়াল জগতের সাথে বাস্তব জগতের পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থতা	২০৫	৫৬.৫০
মেজাজ খিটখিটে হওয়া	২৭০	৭১.২০
নিজেকে আসক্ত মনে করা	২৪৭	৬৫.০০
অমনোযোগী থাকা	২৮৪	৭৪.৯০
কনজুমারিজম টেনডেনসি (ভোগবাদী প্রবণতা) বৃদ্ধি	১৯৫	৫১.৫০
নিজের বডি ফিগার বা চেহারা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা	১১৫	৩০.০০
ফিয়ার অব মিসিং আউট (FOMO) অনুভব	১৪৮	৩৮.৯০
ফেসবুকে সেলফি বা নিজের ছবি আপলোড করার প্রবণতা	১২১	৩১.৮০

উৎস: মাঠ জরিপ ২০২০

বি. দ্র: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিল।

সারণি ৫ থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কারণে ৯৩.২% শিক্ষার্থী একাকীত্ব অনুভব করে; ৮৩.৭% শিক্ষার্থী সামাজিক মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় কাটানোর জন্য বিষণ্ণ থাকে ও নিজেকে অসুখী মনে করে; ৮৩.৭% শিক্ষার্থী এর ব্যবহারের কারণে অস্থিরতা ও মানসিক চাপ অনুভব করে; ৮৩.২% শিক্ষার্থী অন্যের ভালো পোস্ট দেখে ঈর্ষান্বিত হয়; ৭১.২% শিক্ষার্থীর মেজাজ খিটখিটে হয়; ৭৪.৯% শিক্ষার্থী পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে; ৬৫% শিক্ষার্থী নিজেকে সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত মনে করে; ৫৬.৫% শিক্ষার্থী মোহগ্রস্ততা অনুভব করে এবং ভার্চুয়াল জগতের সাথে বাস্তব জগতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়; ৫১.৫% শিক্ষার্থী

উল্লেখ করে যে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে তাদের মধ্যে কনজুমারিজম টেনডেনসি (ভোগবাদী প্রবণতা) তৈরি হয়; ৫০.৫% শিক্ষার্থী মনে করে যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা পরশ্রীকাতর হয় অর্থাৎ তারা সহজেই অন্যের ভালো দেখতে পারে না; ৫০.০% শিক্ষার্থী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে; ৩৮.৯% শিক্ষার্থী ফিয়ার অব মিসিং আউট অনুভব করে অর্থাৎ তারা বেশিক্ষণ অফলাইনে থাকলে তাদের মাঝে অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকর্ষা, খিটখিটে মেজাজসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয় আবার অনলাইনে ঢুকলেই স্বস্তি বোধ করে; ৩১.৮% শিক্ষার্থী উল্লেখ করে যে ফেসবুকে সেলফি বা নিজের ছবি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; ৩২.১% শিক্ষার্থী সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; ৩০% শিক্ষার্থী নিজের বডি ফিগার বা চেহারা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়; অন্যদের তুলনায় নিজেকে মূল্যহীন মনে করে; এছাড়াও সাইবার বুলিং এবং নেতিবাচক এবং সমালোচনামূলক মন্তব্য ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে; নিজের বিষয়ে হীনম্মন্যভাব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ব্যবহারকারীদের হতাশা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।^{১১} যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্য হলো, ২০১০ সাল থেকেই ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিপণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিষণ্ণতায় ভোগার পরিমাণ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা দুটোই বহুগুণে বেড়ে গেছে। যেসব কিশোর কিশোরী স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে দিনে পাঁচ

ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের শতকরা ৪৮ ভাগ অন্তত জীবনে একবার হলেও আত্মহত্যার চিন্তা করে থাকে।^{২২} অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোর-তরুণদের মধ্যে যারা দিনে ৩ ঘণ্টার বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যয় করে তাদের মধ্যে রাগ-ক্ষোভ, হতাশা, বিষণ্ণতা, খিটখিটে মেজাজ, ধ্বংসাত্মক আচরণ, আত্মহত্যা প্রবণতাসহ নানা ধরনের মানসিক সমস্যার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।^{২৩}

মনোবিজ্ঞানী সুজান ক্রাস হুইটব্রানের মতে, ফেসবুক থেকে কাউকে আনফ্রেন্ড করে দিলে সে ফেসবুকের বিচ্ছেদের শিকার হয় যার ফলে সে মানসিক দ্বন্দ্ব ভুগতে থাকে। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা যত বেশি ফেসবুকে লগইন করেন, তত বেশি নিজের জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা নেন এবং মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ফেসবুকের ব্যবহার মানুষের মধ্যে আত্মপূজার বা আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের মানসিক অপরিপক্বতা, যেমন- উদ্বেগ, উৎকর্ষা, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, অসামাজিক আচরণ, তীব্র টেনশন বা উত্তেজনা, সহিংস আচরণ প্রভৃতি।^{২৪}

অন্য একটি গবেষণা প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় যে, স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটের লাগামহীন ব্যবহার আর ভিডিও গেম-ইউটিউব-ফেসবুক নামক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি জীবনঘাতী মাদকের চেয়েও কম ভয়াবহ নয়। যাকে গবেষকরা অভিহিত করেছেন ‘ডিজিটাল কোকেন’ হিসেবে। ফেসবুক ব্যবহার করার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এমন মানুষদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন মিলে গেছে। মাদকের চাহিদা সৃষ্টি হলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে যে ধরনের রাসায়নিক নিঃসৃত হয়, ঠিক একই

ঘটনা ঘটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও।^{২৫}

শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে সামাজিক মাধ্যমে আকর্ষণীয় ছবি আপলোড করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফেসবুকে ঘন ঘন ছবি আপলোড করা তরুণদের একটি নেশায় পরিণত হয়েছে। ফেসবুক আসার পর থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যের প্রশংসা কুড়ানো ও মনোযোগ আকর্ষণের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যাচ্ছে।^{২৬} এটি নিয়ে যুক্তরাজ্যের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়- ওয়েস্ট অব ইংল্যান্ড, এডিনবরা ও বার্মিংহামের এর গবেষকরা বিশ্লেষণ করেন যে, ঘন ঘন ছবি প্রকাশ বাস্তব জীবনে ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি ব্যবহারকারীকে জনবিচ্ছিন্ন করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।^{২৭}

অসর্তকভাবে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। নিজের ছবি নিজে তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্য ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণপ্রিয়, তারাই মূলত এই রোগে আক্রান্ত।^{২৮} সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইন্ড ব্রেন বিহেভিয়ার ও সায়েন্স অব হ্যাপিনেস ও টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা মটোরোলার যৌথ উদ্যোগে একটি জরিপে দেখা গেছে, ৬৫ শতাংশ ভারতীয় তরুণদের কাছে প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ জনের চেয়েও প্রিয় হলো তাদের স্মার্টফোনটি। স্মার্টফোন-আসক্তরা ক্রমশ জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। তাদের কাছে মনে হয় স্মার্টফোন ছাড়া একদিনও চলা সম্ভব নয়। এমনকি এটা সাথে না থাকলে বা হারিয়ে ফেলার ভয়ে প্রায়শই তারা ভীষণ অস্থিরতা বা আতঙ্কে ভোগেন যা নোমোফোবিয়া নামে পরিচিত।^{২৯}

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট ডগলাস জেনটাইল বলেন, ভার্চুয়াল বা ভিডিও গেমের আসক্ত শিশু বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ভায়োলেন্ট ভিডিও গেম খেলা আত্মসী চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও আচরণকে উসকে দেয়, এর ফলে ঘটনার শিকারের প্রতি সহমর্মিতা কমে যায়। গেমার যতবেশি ভিডিও গেম খেলে, ততবেশি ভায়োলেন্ট হয়, তাদের আচরণও হয় ততবেশি আত্মসী।^{৩০}

৪. উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের উপর ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বেশি। এর সাহায্য নিয়ে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সহায়ক উপকরণ হিসেবে এর ব্যবহার কর্ম ও যোগাযোগ দক্ষতার বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা এর ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করে একাডেমিক সফলতা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও স্মার্টফোন আসক্তি; ভার্চুয়াল জগতকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান; পড়ালেখায় অনীহা, কখনরীতি ও ভাষার উপর নেতিবাচক প্রভাব, স্বাস্থ্যহানি, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য সামাজিক মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করে সন্তানের সাথে পিতামাতা এবং পরিবারের দূরত্ব কমাতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, গ্রন্থাগারে যাওয়া, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি দ্বারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি শিক্ষার্থীদের আসক্তি কমানো যায়। সামাজিক মাধ্যমে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে সঠিক সময়ে

খাওয়া, পড়ালেখা, পর্যাপ্ত ঘুম, ব্যায়াম, পরিবারের কাজে সহযোগিতা করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। এটি ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ঈর্ষাপরায়ণতা, হীনম্মন্যতা, হতাশাবোধ, স্বার্থ বা আদর্শগত দ্বন্দ্ব, উচ্চাভিলাষ ইত্যাদিকে দূরে রেখে এর ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও একাডেমিক পড়ালেখার উপর এর প্রভাব; বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তির সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ধরন; উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাইরে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব, যুব সমাজের সামাজিকীকরণে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা, যুব সমাজের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার ও সাইবার অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. Singh Harpreet and Laxmi Vijay, "Social Networking Sites- A Study of Its Impact on Personal and Social Life," International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 3, no. 3, 2015
2. আকতারুজ্জামান এবং জয়শ্রী ভাদুড়ী, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তিতে তারুণ্য', বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, মে ২৭, ২০১৯, <https://www.bd-pratidin.com/last-page/2019/05/27/427125> (accessed February 23, 2021)

৩. Mohammad Heba, and Tamimi Hatem, "Students' Perception of Using Social Networking Websites for Educational Purposes: Comparison between Two Arab Universities," International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) 9, no.2, May 2017
৪. Rideout Victoria, "Children, Teens and Entertainment Media: The View from the Classroom," Commonsense Media, Sanfrancisco, New York, 2012, www.common sense.org /research
৫. Singh Monica Munjilal and et.al., "Social Media Usage: Positive and Negative Effects on the Life Style of Indian Youth," UCT Journal of Social Science and Humanities Research 5, no. 4, 2017
৬. "ইন্টানেট ঝুঁকিতে দেশের ৩২ শতাংশ শিশু!" মাসিক কম্পিউটার জগৎ, (ঢাকা): ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৭৫
৭. রায় দেবশীষ কে ও রাকিব রোকন, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: নতুন সম্ভাবনা, নতুন সংকট" ম্যাজিক লন্ঠন, সংখ্যা ২, জানুয়ারী ২০১২, <http://www.magiclanthon.org/article.php?id=117&article=> "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: নতুন সম্ভাবনা, নতুন সংকট" (accessed 1 March, 2021)
৮. C., Chou, & , M.C. Hsiao, "Internet Addiction, Usage, Gratification, and Pleasure Experience: The Taiwan College Students' Case," Computers and Education 35, 2000
৯. H.Nie Norman, and Sunshine D. Hillygus, "The Impact of Internet Use on Sociability: Time Diary Findings," IT and Society 1, issue 1, Summer, 2002 <http://www.ITandSociety.org>
১০. Lee S.J. "Online Communication and Adolescent Social Ties: Who Benefits more from Internet Use?" Journal of Computer-Mediated Communication (২০০৯): ৫০৯-৫৩১, Doi:10.1111/j1083-6101.2009.01451.x.
১১. কামাল মোহিত, মন, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৬
১২. আলদীন আনোয়ার, "বিচ্ছেদ বাড়ছে, ভাঙছে সংসার" দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ ২০১৯
১৩. Saha Shilpi Rani and Guha Arun Kanti "Impact of Social Media Use of University Students," International Journal of Statistics and Applications 9, no.1, 2019
১৪. Singh Monica Munjial, Amiri Mohammad and Sabbarwal Sherry, "Social Media Usage: Positive and Negative Effects on the Life Style of Indian Youth," Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research 5, issue no.3, 2017
১৫. দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন (পাকিস্তান), ১৫ মার্চ ২০১৭
১৬. দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন (পাকিস্তান), ১৫ মার্চ ২০১৭
১৭. দ্য বোস্টন গ্লোব (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬
১৮. Bryant Aaron, "The Effect of Social Media on the Physical, Social, Emotional and Cognitive Development of Adolescents," Honors Senior Capstone Projects 2, no 3, 2018
১৯. নিউইয়র্ক টাইমস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ২৫ জানুয়ারি ২০১৮
২০. Asante Kwaku Oppong and Nayarko

বর্গি হাঙ্গামার প্রেক্ষিতে ‘মহারাষ্ট্রপুরাণ’ ও ‘আঁধারমানিক’: প্রসঙ্গ এক্সোডাস

সুমন সাহা

সারসংক্ষেপ

বাইবেলের এক্সোডাস কোনো বিচিত্র ঘটনা নয়। সেকালে ইহুদিদের দিয়ে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হল, তা আজও অন্যান্য দেশে অব্যাহত। দুটো বিশ্বযুদ্ধ, আকাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, দেশভাগের বেশে এসে এক্সোডাস মানুষের জীবনকে এখনও আলোড়িত করে। কিন্তু মধ্যযুগের বঙ্গে আরো একটি কারণে মানুষ দেশান্তরী হয়েছিল। সেটা হয়েছিল বহিরাগত শত্রুর আক্রমণের ফলে অর্থাৎ বর্গি আক্রমণের ফলে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর প্রতিফলন কম। তবে কবি গঙ্গারাম ‘মহারাষ্ট্রপুরাণে’ বর্গি হাঙ্গামার কথা লিখে নিয়ম রক্ষা করেছেন। এত বড় ঘটনা নিয়ে তৎকালীন কবিরো তেমন কিছু বলেননি। আধুনিককালে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্রপুরাণ’ ও মহাশ্বেতা দেবী রচিত ‘আঁধারমানিক’ উপন্যাসে বর্গি আগমনের ফলে মানুষ কিভাবে প্রাণে বাঁচতে স্বভূমি থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য অঞ্চলে, তা নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যাওয়া তাঁদের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সময়ে, তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুমন সাহা
পিএইচডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: sumankolkata.saha@gmail.com

মূলশব্দ

এক্সোডাস, বর্গি হাঙ্গামা, আঁধারমানিক, মহারাষ্ট্রপুরাণ, Internal Migration

ভূমিকা

‘এক্সোডাস’, ‘ডায়াসপোরা’, ‘মাইগ্রেশন’, বাংলায় বললে অভিপ্রয়াণ, গণপ্রব্রজন, দেশান্তর; নাম যাই হোক, এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যেটি যে কোনো

সময়ে, বিশেষ কোনো কারণে ঘটতে পারে। এই কারণ নানা প্রকার হতে পারে। এক্সোডাস অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে কোনো কারণে ছড়িয়ে পড়া। এই এক্সোডাসের প্রতিশব্দ হিসেবে ডায়াসপোরা,

মাইগ্রেশন শব্দগুলো ব্যবহার করা যায়। যদিও সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য আছে প্রতিটি শব্দের মধ্যে। আপাতত সেই জটিলতায় না গিয়ে এই প্রবন্ধে এক্সোডাসের কারণ অনুসন্ধান করা যাক। এখানে এই এক্সোডাসের কারণ হল আঠারো শতকে বঙ্গে বর্গি আক্রমণ। ১৭৪২-১৭৫১ পর্যন্ত টানা নয় বছর ধরে বঙ্গে বর্গি হাঙ্গামা হয়েছিল। ‘বর্গি’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল ‘বার্গি’র থেকে। এই মারাঠি শব্দের অর্থ হল নিঃস্রমানের মারাঠা সৈনিক। তাদের পারিশ্রমিক যেমন অত্যন্ত সামান্য ছিল, তেমনি তাদের লুণ্ঠন, অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হতো। তাদের হিংস্রতা, নৃশংসতার শিকার হতে হয়েছিল তৎকালীন বাঙালিকে। বাংলা সাহিত্যে, সমাজে, সংস্কৃতিতে বর্গিদের এই অতর্কিত আক্রমণের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল অনেক কিছু। বাংলার ঘরে ঘরে মায়েরা কোলের খোকাকে ঘুম পাড়াতে দেশে বর্গি আগমনের গান গাইত। বর্গিদের আসার আগে খোকাকে ঘুম পাড়াতে হবেই, সমস্ত পাড়া জুড়াতেও হবে। নাহলে বর্গিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা নেই। তারা খাজনা না পেলে ছাড়বে না। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত ‘চিত্রচম্পূ’ নামক সংস্কৃত কাব্যে বর্গি হাঙ্গামার প্রথম দিকের কথা আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই বর্গি আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে কবি গঙ্গারামের ‘মহারাত্রিপুরাণে’। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও বর্গি আগমনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘রাধা’ উপন্যাসের পটভূমিতে বর্গিদের প্রসঙ্গ এসেছে। তারপর মহাশ্বেতা দেবী রচিত ‘আঁধারমানিক’ উপন্যাসে বর্ধমানের আঁধারমানিক গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বর্গি আক্রমণের ফলে ভীত, সন্ত্রস্ত, আত্মরক্ষার তাগিদে পলায়মান মানবসমাজের এক বাস্তব চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। বঙ্গে বর্গি আক্রমণের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে

উপন্যাসটি লেখা হয়। ‘আঁধারমানিক’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে।

বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, ভাস্কর পণ্ডিত তার সৈন্য, সামন্তদের নিয়ে ‘চৌথ’ আদায়ের উদ্দেশ্যে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায়। তারা চৌথ আদায়ের নামে হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার, উৎপীড়ন দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে কুষ্ঠাবোধ করেনি। তাদের আসার আগে বর্গি সম্পর্কে কোনো ধারণা তৎকালীন বাঙালিদের মনে ছিল না। হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভীত মানুষজন পরিবার সমেত দলে দলে ভিটে মাটি ত্যাগ করে পালাতে শুরু করে। যে যে দিকে পারে, সেই দিকে পালাতে থাকে প্রাণ রক্ষার জন্য। তারা মূলত যে দিকগুলো পালানোর জন্য বেছে নেয়, তা হল- পূর্ববঙ্গ, কলিকাতা ও উত্তরবঙ্গ।

গৃহহারা এই মানুষগুলো বর্গি আক্রমণের প্রভাবে কলিকাতা, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে দেশান্তরিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী এই শব্দটি ব্যবহার না করলেও এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। এই যাওয়া-আসার ইতিহাস লক্ষ করে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন—

“এই উপন্যাস লেখার আগে আর একটি জিনিস আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজও যে ভাবনা বলতে গেলে আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করে আছে- তা হল লোক-চলাচলের ইতিহাস।”^১

এই ‘লোক-চলাচলের ইতিহাস’ ও দেশান্তর পাশাপাশি রাখলে দেখা যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। একটাই কথা বা বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা। মহাশ্বেতা দেবী কথিত ‘লোক-চলাচলের ইতিহাস’ যে দেশান্তর, এক্সোডাস,

Migration কিংবা Diaspora প্রসঙ্গকে ব্যঞ্জিত করে, সে কথা বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বর্গি আক্রমণের ফলে এই শরণার্থীদের যাতায়াতের এবং ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া নিয়ে অথবা তাদের যাওয়া-আসার ইতিহাসকে নিয়ে তৎকালীন কোনো কবি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। মহাশ্বেতা দেবীর মতে তাঁরা এক্ষেত্রে ‘আশ্চর্যরকম মিতবাক্’। তিনি সরাসরি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে একথা বলেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ বর্গি হাস্গামার কথা স্বল্পাকারে আছে। তবে কবি গঙ্গারাম ‘মহারাষ্ট্রপুরাণে’ এই বর্গি আক্রমণের কথা লিখেছেন।

এখানে দেখা যায়, মানুষের পাপের বোঝা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে প্রতিকার চান। ব্রহ্মা তাঁকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন। শিবদেশে নন্দীগড় সেতারার সাহু রাজার ওপর ভর করেন। সাহু রাজার অধীন নাগপুরের সামন্ত ছিলেন রঘুজী ভৌসলে। তাকে বাংলা থেকে চোখ আদায়ের আদেশ দিলে সে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিযুক্ত করে। তারপর ভাস্কর পণ্ডিত বঙ্গদেশে এসে ধ্বংসলীলা চালাতে শুরু করে। এর ফলে বঙ্গদেশ প্রায় শূন্যে পরিণত হয়। বিপন্ন মানুষ গ্রাম ছেড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ‘মহারাষ্ট্রপুরাণ’ কাব্যে এ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল :

“ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনারবাইনা পলাএ কত নিন্তি হড়পি লইয়া।।
গন্ধবণিক পলাইএ দোকান লইয়া জত।
তামাপি তল লইয়া কাসারি পলএ কত।।

.....
চতুর্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত।।

কায়স্থ বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল।।”^২

এমনকি এই পলায়মান মানুষদেরকেও বর্গিরা অত্যাচার করেছিল। বঙ্গের যেসব গ্রাম বর্গিরা পুড়িয়ে ছারখার করেছিল এবং যার ফলে মানুষ উদভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়তে থাকে, সেগুলির উল্লেখ কবি গঙ্গারাম ‘মহারাষ্ট্রপুরাণ’ কাব্যে করেছেন—

“চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর, আর দিগনগর।

ক্ষিরপাই পোড়াএ আর বর্ধমান শহর।।

নিমগাছি সেড়গাঁ আর সিমইলা।

চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনইলা।।

এই মতে বর্ধমান পোড়াএ চারিভিতে।

পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে।।”^৩

এইসব গ্রাম শূন্য করে তারা আঁধারমানিক গ্রামে আসে ‘রাস্গমাইটা দিয়া’। অর্থাৎ ‘মহারাষ্ট্রপুরাণে’ আঁধারমানিক গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি আঁধারমানিক গ্রাম কোনো কাল্পনিক অঞ্চল নয়। এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বর্গি হাস্গামার মর্মান্তিক চিত্র মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরেছেন। বর্গি আক্রমণের ফলে যে বিপুলসংখ্যক মানুষের স্থানান্তর ঘটল, সেই বর্গি আক্রমণের আসল কারণ জেনে নেওয়া যাক। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার দেওয়ান হয়ে আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি ১৭১৩-তে বাংলা-বিহার-ওড়িশার সুবেদার হন। তাঁর মৃত্যুর পর এই অঞ্চলের সুবেদার হন তাঁরই দৌহিত্র সরফরাজ খান। কিন্তু পিতা সুজাউদ্দিনের ষড়যন্ত্রে তিনি সিংহাসন হারান। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান আবার ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এরপর ১৭৪০-এ সরফরাজ আলিবর্দির সঙ্গে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা হারান। আলিবর্দির প্রতি দিল্লির সম্রাট মুহম্মদ শাহ অসন্তুষ্ট হলেন কিছু কারণে। বাংলার সিংহাসনে আলিবর্দি শাসক নিযুক্ত হলে

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত হন। ঠিক এই সময়ে বর্গি হাঙ্গামা শুরু হয়। লোভ, প্রভাব, প্রতিপত্তির বশে এবং দাক্ষিণাত্যের নিজাম আসফ খাঁ-র প্ররোচনায় রঘুজী ভৌসলে বাংলা লুণ্ঠের নির্দেশ দেয় ভাস্কর পণ্ডিতকে। প্রথম বাজি রাওয়ের মৃত্যুর পর রঘুজী ভৌসলে বাংলার দিকে তাক করতে থাকে। আসফ খাঁ-র মতে হিন্দুস্থানের কোষাগার হল বাংলার ধান ও রেশম। এই কথা শুনে—

“উচ্চাশা কুপরামর্শের বাতাস পেয়ে গনগনিয় জ্বলতে
লাগল।

রঘুজীর আদেশ পেয়ে ‘ভাস্কর চলিল ধাইয়া সৈন্য সঙ্গে
করিয়া

সাজন।’ সঙ্গে সৈন্য সবাই বর্গী। চালাবার মতো
একটি ঘোড়া।

এবং ঘোরাবার মতো একটি তলোয়ার থাকলে
একমুঠো ছোলা

চিবোতে চিবোতে যুদ্ধে যেতে পারে। তারপর
ওড়িশার আকাশ

অন্ধকার হল। বিনা চেষ্টায় কটক জয় করে বাংলার
আকাশে

সংবর্তক মেঘের মতো দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিলে
বর্গী।”^৪

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বর্গি হাঙ্গামার ফলে নবাব, জগৎ শেঠের মতো ব্যক্তিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের পরিবারের লোকজনকে অন্যত্র পাঠাতে বাধ্য হয়। কারণ তারা কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিছুই মানত না। তারা শুধুমাত্র লুণ্ঠন করে। আর এই কাজে বাঁধা পেলে তারা হত্যা, অত্যাচারসহ নানা প্রকার ঘৃণ্য কাজ করতে পিছপা হয় না। সেই জন্য বর্গি আক্রমণের ভয়াবহতার কথা আন্দাজ করে—

“স্বয়ং নবাব এবং জগৎশেঠ ঢাকায় পরিবারবর্গকে
স্থানান্তরিত
করলেন। সুতরাং সবাই পালাতে লাগলেন। যাঁরা
পারলেন না,
তাঁরা এক জায়গায় জিনিসপত্র, অন্যত্র পরিবারবর্গ এবং
নিজে
অন্য এক জায়গায় পলাতক হলেন।”^৫

আলোচ্য উপন্যাসে বর্গিদের প্রথম দেখতে পায় ছোট বৌ কুন্দ। সে-ই প্রথম বর্গি দেখে বলে ওঠে— ‘তুরুক সওয়ার’ পাগড়ি (পাগগ) মাথায় তুরুক সওয়ার। আঁধারমানিক গ্রামে বর্গি হাঙ্গামার ফলে সবার আগে অন্ত্যজ পাড়ার বাগদীরা বর্গিদের সঙ্গে না পেরে জঙ্গলে স্থানান্তরিত হয়। ওদিকে কুন্দের পিতৃগৃহে সবাই বর্গিদের হাতে মারা যায়। বড় আচার্যের কন্যা নির্মালা বা নিমলির থেকে বর্গি গয়না কেড়ে নিয়েছে। বর্গিতে ছুঁয়েছে নিমলিকে। তাই তাকে আর সমাজে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। কোনো নারীকে বর্গিতে ছুঁলে সে সমাজে পতিতা হয়। তাই তাকে আর গ্রামে না রেখে নির্বাসন দিতে হবে। সে জন্য “স্থির হল নিমলি নবদ্বীপ যাবে। সেখানে অনাথার ঠাঁই মেলে,...”^৬

নির্মলা যখন নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হচ্ছিল, তখন আঁধারমানিক গ্রামের লোকজন সবাই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখল শুধু, কিছু করলো না। এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের সংস্কার অটুট ছিল। এমনই সংস্কারে আছন্ন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদিন বক্সীদেওয়ানের প্রতিবাদ করে বলেছিল—

“হিন্দু হয়ে আপনি বলছেন বাস্তব ছেড়ে যাব? আমার বাস কাটোয়াতে আজ বহুদিন। পূর্বপুরুষ এসেছিলেন অযোধ্যা হতে, আর আমরা এদেশ ছেড়ে যাইনি।”^৭

এই ব্রাহ্মণের কাছে সংস্কারের মহিমা এতটা বেশি যে, তার মতে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্থানান্তরিত হওয়া

ধর্মসঙ্গত নয়। অথচ তার পূর্বপুরুষ বহুকাল আগে অযোধ্যা থেকে বঙ্গের কাটোয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্গি হাস্ফামার ফলে এই সব সংস্কার মুছে ফেলে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই পথে নামে, পালাতে থাকে প্রাণ রক্ষার তাগিদে। বর্গিদের ভয়ে ফিরিস্জিরা পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। যুগলপ্রসাদ বলেছিল—

“আপনারা জানেন কিনা জানি না, ফিরিস্জিরা অবধি দেশ ছেড়েছে দেশান্তরী হয়েছে। কাশিমবাজারের কুঠিতে না আছে ইংরেজ, না আছে ফরাসি, না আছে ওলন্দাজরা।”^৮

সুরকর্ষ বলেছিল দক্ষিণ থেকে বর্গিরা আবার আসবে। চাষী, কুমোর, তাঁতি, কামার সকলে জাত ব্যবসা ছাড়বে। শত শত মানুষ ‘দেশান্তরী’ হবে। সে আরো বলেছিল, লোভে মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। যে মনটা রঘুজী ভোঁসলে করেছিল। তবু সুরকর্ষ দার্শনিকের মতো আনন্দীরাম ও কাশীশ্বরকে বলেছিল—

“একপক্ষে ভালোই হবে। এদেশের মানুষ পদ্মাপারে যাচ্ছে, উত্তরে

যাচ্ছে, ওড়িশার মানুষ মেদিনীপুরে, এই ডামাডোলের মধ্যে কিছু

কি ছুমারাঠি বেটা কাশিমবাজারে বসবাস শুরু করেছে আরে,

এই যে এমনি নাড়াচাড়া পড়ে এ-ও তিনিই করাচ্ছেন।”^৯

এই যে ‘লোক-চলাচলের’ পর্ব শুরু হল, তা চিত্তিত করেছিল হুগলীর বাব্র-বন্দরের কুঠির সাহেবদের। ব্যাঙেল চার্চের নিভূতে বসে ফাদার আস্তোনিও তার ডায়রিতে লেখেন—

“এক্সোডাস। যে মন দেখা গিয়েছিল যীশুর জন্মের আগে ইশ্রায়েলে।

যে মন দেখা গেছে অন্যত্র, নিউওআর্লডের কলোনিতে। এক্সোডাস।—

দি ম্যান ইজ ট্র্যাপড। এদিকে বাংলায় চলেছে এক্সোডাস

ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেরা চলে যাচ্ছে ইস্টে, নর্থেরে। আইরিপিট মাইসেলফ, অ্যাজ হ্যাপেনড ইন ইশ্রায়েল, অন্যত্র যুগে যুগে। আমার জানতে হচ্ছে হচ্ছে, বাংলায় এ এক্সোডাস আগে কতবার ঘটেছে। কখনই কি হয়নি?”^{১০}

এর আগেও বঙ্গে এই ‘এক্সোডাস’ বা স্থানান্তর ঘটেছে। আদি যুগ থেকে নদী, সমুদ্র পেরিয়ে, হিমালয়ের বাধা অতিক্রম করে নানা পণ্য নিয়ে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল পারসিক, আবিসিনিয়, মুসলমান, জর্জীয়, আর্মেনিমেনিয়া, ইহুদি প্রভৃতি। কারণ তখন বঙ্গের মুর্শিদাবাদ ছিল ভারতের সমৃদ্ধতম নগরী ও পৃথিবীর অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। এছাড়া দাসী, বাঁদী বিক্রয় প্রসঙ্গেও স্থানান্তর প্রক্রিয়া ঘটেছিল। একটি বাঁদী বিক্রির রসিদ থেকে জানা যায়, মরক্কো দেশীয় এক ব্যবসায়ী হায়দ্রাবাদের নিলামের অনুমোদনে দাস বিক্রয়ে অধিকার প্রাপ্ত মির্জা ইস্পাহানি চট্টগ্রামের আব্বা ফারুকীর কাছ থেকে পনের বছরের গুলরুখ নামক একটি মেয়ে বিক্রি করে। তার দাম একান্ন টাকা। অতএব গুলরুখ বা তার মতো দাসদাসীদের ফাঁদে পড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থানান্তরিত হতে হবে। উপন্যাসে এই বিবরণগুলো থেকে বোঝা যায়, এই প্রবণতা সুপ্রাচীন।

আঁধারমানিকের লোকেরদের বেশির ভাগ মানুষ পালাবার ক্ষেত্রে শহরের অভিমুখে ছুটতে থাকে। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা যেখানে নবাব, সেখানেই আশ্রয় পাওয়া যাবে। তাদের ধারণা গ্রামে যেমন বিপদ, শহরে হয়তো তত বিপদ নেই। সেখানে মাথাওয়ালা মানুষ বসবাস করে, তাদের বুদ্ধি

আছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, আঁধারমানিক গ্রাম থেকে যেমন মানুষ পালানোর ফলে গ্রাম খালি হয়, তেমনি বর্গি হাঙ্গামার ফলে অন্য অঞ্চলের গ্রামের মানুষ আঁধারমানিকে স্থানান্তরিত হয়ে আসে। একটা যেন মিশ্রণ ঘটে যায় সর্বত্র।

সকলে এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে দেবতার কাছে অভিযোগ করলে মহীপতি যুক্তিসম্মত কথা বলে—

“... এ বিপদ মানুষের তৈরি। এতে দৈবের হাত কোথায়?”^{১১}

ফাদার পিওঁজার মতে যারা চলে যাচ্ছে তারা আবার ফিরবে। তারা ইউরোপ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। তাদের মনে ‘এক্সোডাস’ সম্পর্কিত একটা ধারণা আগে থেকেই ছিল। তাঁরা বর্গি আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলা বলতে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরকে বুঝলেন এবং তাকে পৃথিবীর মানচিত্রে বসিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। তাদের উচ্চশিক্ষিত মাথায় যে বোধ স্থানান্তর নিয়ে জন্ম নিল, সেভাবে তো সুরকর্ষ, মহীপতি, আনন্দীরাম ভাবতে পারল না। তারা পালাতে পালাতে ক্লান্ত। হীরালাল শেঠ যিনি একসময় দেশ ছেড়ে যাবেন না বলে বন্ধপরিষদ ছিলেন, তিনিও বছর দুই-একের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হলেন।

আশ্বিন মাস এসে গেল। বর্গি হাঙ্গামা তখনও চলছে। প্রতি বছর দেবী দশভুজার আগমনে মুখরিত হত যে বঙ্গদেশ, সেই আলো ঝলমলে বঙ্গের রূপ এবার দেখা গেল না। এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যেও কোনো মতে গোপনে পুজো সারা হল। ওদিকে বর্গিরা কাটোয়াতে বিপুল অর্থ ব্যয়ে দুর্গাপূজা করল। কিন্তু তাতে কোনো কাঙালী বস্ত্র পেল না, মানুষ প্রসাদ পেল না, চামর দুলিয়ে, পা মুছিয়ে প্রতিমা বরণ হল না। ভাস্কর পণ্ডিতের এই দুর্গাপূজার ফাঁকে নবাব

সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলে ভাস্কর পণ্ডিত পালিয়ে মেদিনীপুরে যায়। শুরু হল মেদিনীপুরে বর্গি হাঙ্গামা। এবার মেদিনীপুরের মানুষ বর্গি আক্রমণের ফলে উৎখাত হয়ে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে চর্মকর্মার, বৈদ্য, ব্রাহ্মণসহ বাউল, ফকির, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব বড়গঙ্গার দিকে সব ছেড়ে পালাতে শুরু করে। তারা গঙ্গা পেরিয়ে যে যে দিকে খুশি যাবে। মহীপতি, আনন্দীরাম আঁধারমানিক ত্যাগ করে চিরদিনের মতো কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মহীপতি সকলকে নিয়ে স্থানান্তরিত হতে হতে রাজশাহীতে পৌঁছায়। কিন্তু তারা যে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হল, সেখানে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে তারা জানে না—

“সে যুগ কেমন হবে? ঠিক এই রকম? এরই পুনরাবৃত্তি, না নতুন, অন্যরকম বিচিত্র?”^{১২}

তারপর নবাব আলিবর্দির মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগও যেন শেষ হয়। কাশীশ্বর তাদের একটা নতুন যুগের, নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে থাকে। এই স্বপ্ন, কল্পনাতেই উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়।

উপসংহার

সরাসরি এক্সোডাসকে উপজীব্য করে রচিত এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এখানে যেমন ‘এক্সোডাস’ের প্রসঙ্গ আছে, তেমনি মানুষগুলোর জীবন ‘এক্সোডাস’ের ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারও বর্ণনা আছে। আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত এই গণপ্রব্রজন প্রকৃতির সঙ্গে ‘Victim Diaspora’, V. S. Naipal কথিত ‘বলপূর্বক ডায়াসপোরা’ মার্কণ্ড পরজ্ঞাপ কথিত ‘আগন্তুক ডায়াসপোরা’র সাদৃশ্য রয়েছে। আদতে এটা অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বা Internal Migration। কারণ বর্গিদের ভয়ে মানুষ পিতৃপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে,

বলা ভালো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তারা কেউ কিন্তু দেশান্তরী হয়নি।

যদিও তৎকালীন সময়ে ‘দেশ’-এর ধারণা ও বর্তমানে ‘দেশ’-এর ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। তখন একটাই দেশের অভ্যন্তরে মানুষ স্থানান্তরিত হতে থাকে।

ড. অণিমা মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন—

“... হতে পারে পার্শ্ববর্তী নিরাপদ জেলা, হতে পারে
সেই জেলারই
কোন দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে বর্গীরা পৌঁছতে
পারবে না।”^{১০}

আরো একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, তা হল বর্গি আক্রমণের ফলে বঙ্গের মানুষ দেশান্তরী হয়েছিল যেমন, তেমনই বর্গিরাও মহারাষ্ট্র থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বঙ্গে এসেছিল। তাদের স্থানান্তরকে বলা যেতে পারে Labour Diaspora। কারণ প্রথমেই বলা হয়েছে বর্গিরা সৈনিক হলেও, নিম্নমানের। তাই তাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা তাই করে থাকে। নির্দেশ পেলে তারা হাজারে হাজারে এসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সর্বস্ব ধূলিস্মাৎ করে দিতে পারে।

‘মহারাষ্ট্রপুরাণে’ এবং ‘আঁধারমানিক’ উপন্যাসে সে কথা সুস্পষ্ট। তাদের কেউ কেউ আবার বঙ্গে থেকেও গিয়েছিল। উপন্যাসে সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. দেবী, মহাশ্বেতা, *আঁধারমানিক*, বিনীত নিবেদন অংশ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৫, প্রথম করুণা সংস্করণ- ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ২-৩

২. মুস্তাফী ব্যোমকেশ, কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৩ সন, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ২২২-২২৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, *আঁধারমানিক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৫, প্রথম করুণা সংস্করণ- ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৫৩
৫. মুখোপাধ্যায় ড. অণিমা, *আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৯৪ আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ২১
৬. দেবী মহাশ্বেতা, *আঁধারমানিক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৫, প্রথম করুণা সংস্করণ- ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৬৭
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯
১৩. মুখোপাধ্যায় ড. অণিমা, *আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ*, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৯৪ আগস্ট ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ. ৩৩



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

English Section

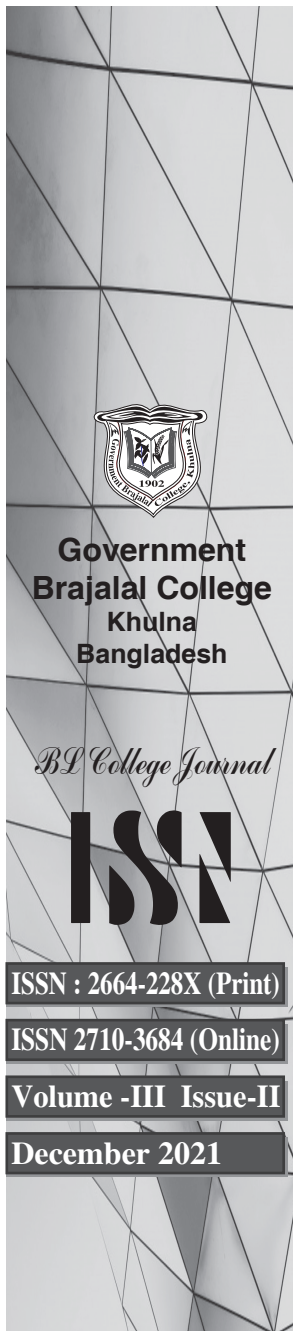
Contents

English Section

- ◆ Parallelism Between Uniform and Normal Percentiles
Anwar H. Joarder 57-64
- ◆ Portrayal of Submission and Defiance of Women in Literature by South Asian Women Writers
K.P.S. Subhani 65-73
- ◆ Male 'I' and the Trope of Failure in Shashi Deshpande's *The Dark that Holds No Terrors*
Dr. Sabreen Ahmed 74-84
- ◆ Case Study Review and Modeling of In-house Training for Enhancing Professional Intelligence of College Teachers
Mahadi Hasan Bappy & Dr. Shamsiah Banu Mohamad Hanefar 85-99
- ◆ Mental Health Status in Relation to Adjustment during COVID- 19
Dr. Abu Syed Md Azizul Islam 100-110
- ◆ Socio-political Mobilisation of Madrassas and Muslims in Colonial Surma-Barak Valley
Dr. Mahbubur Rahman Laskar 111-123



Volume -III, Issue-II, December 2021





**Government
Brajlal College
Khulna
Bangladesh**

BL College Journal

ISSN

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

Volume -III Issue-II

December 2021



Parallelism Between Uniform and Normal Percentiles

Anwar H. Joarder

Abstract

Percentiles of a general normal distribution are usually introduced through that of a standard normal distribution. Students usually see this kind of transition in probability theory for the first time. In this paper, we introduce the percentile of standard uniform distribution to determine that of a general uniform distribution. This parallelism will benefit the students and instructors. The parallelism required to introduce a uniform distribution with mean and variance.

Anwar H. Joarder

Department of Computer
Science and Engineering
Faculty of Science and Engineering
Northern University of
Business & Technology Khulna
Khulna 9100, Bangladesh

Emails: ajstat@gmail.com,
anwar.joarder@nubtkhulna.ac.bd

Keywords

Percentiles, Normal Percentiles, Uniform Percentiles

1. Introduction

As the sample size increases, the class widths of a frequency distribution of a sample decrease and the shape of the resulting graph of relative frequency curve or density histogram becomes smoother. We assume a continuous probability function can be used to approximate the resulting distribution. This is quite meaningful if the variable is continuous. See for example, Derouet and Parzysz (2016).

The probability density function of the continuous uniform distribution on a line segment can be introduced easily as it depends on the maximum and minimum value of the variable. The probability of any event is also the area of a rectangle determined by the event. Then the notion that the area is an integral can be gently introduced.

The above paves the way for introducing integral to calculate probability of any event under normal distribution.

The probabilities of events in normal distribution cannot be easily calculated without a calculator or a Normal Percentile table. Students in service courses use normal probability or percentile extensively. Students see for the first time that a normal probability or percentile of a general normal distribution depends on another standard normal distribution. But we felt that the introduction to general normal distribution can be preceded by general uniform distribution. This is because the standard or general uniform distribution is the simplest continuous distribution. In this paper, we limit ourselves mostly to determine percentiles. A user friendly computer package Minitab provides probabilities and percentiles of most popular distributions by graphs.

The percentiles of a standard normal distribution requires to evaluate a difficult integral whose approximation has been an area of research for well over 100 years. See for example Johnson, Kotz and Balakrishnan (1994), Bryc (2002), Marsaglia (2004), Shore (2005) and Lin (2009). The paper by Choudhury (2014) seems to be the simplest approximation for recent research in the area. In particular, In Section 2, we introduce a standard uniform distribution with mean 0 and variance 1, and use its percentile to determine the percentile of any general

uniform distribution. In Example 2.2, 75th percentile of salaries is directly calculated with the assumption that salaries follow a general uniform distribution but in Section 3 it is repeated through a standard uniform distribution. The issues in Section 3 is repeated in Section 4 assuming a normal distribution. Thus the main contribution of the paper is the parallelism between general uniform distribution and general normal distribution in determining percentiles. We introduce standard uniform and standard normal distributions to determine percentiles of any general uniform and general normal distribution. A general formula is conspicuously demonstrated In Table 5.1 and Table 5.2. This will be instructive to students and instructors especially to service courses in statistics.

2. The Uniform Distribution

For a continuous random variable X , the uniform distribution has the same probability on any line segment with the same length.

2.1 The Uniform Distribution with Minimum and Maximum

Let X have a uniform distribution on a line segment $[a, b]$. Then it is an area of a rectangle with base $b - a$ and height d so that the probability that X is less than

$c(a < c < b)$ is given by

$$\frac{(c-a)d}{(b-a)d} = \frac{1}{b-a} \times (c-a).$$

Since the area of the rectangle in uniform distribution is $\text{base} \times \text{height}$, or, $(b-a)d$, the height $f(x) = d$ should be

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b. \quad (2.1)$$

We will denote the above distribution by $X \sim U(a, b)$.

The probability $P(a_1 < X < b_1)$ of any event $a_1 < X < b_1$ where $a \leq a_1 < b_1 \leq b$ is given by the area of a rectangle with base $b_1 - a_1$ and height $f(x)$, i.e.,

$$P(a_1 < X < b_1) = (b_1 - a_1) \times f(x) = \frac{b_1 - a_1}{b - a}.$$

That is, the probability of an interval is proportional to its length. The above can also be represented by an integral

$$P(a_1 < X < b_1) = \int_{a_1}^{b_1} f(x) dx.$$

Let $P(X \leq k) = 1 - \alpha$, so that $P(X > k) = \alpha$, and the quantity k can be remembered as $_{1-\alpha}x_\alpha = k$. The quantity k is the $100(1 - \alpha)$ -th percentile of the distribution of X . It is popularly, denoted by x_α . If $X \sim U(a, b)$, then obviously

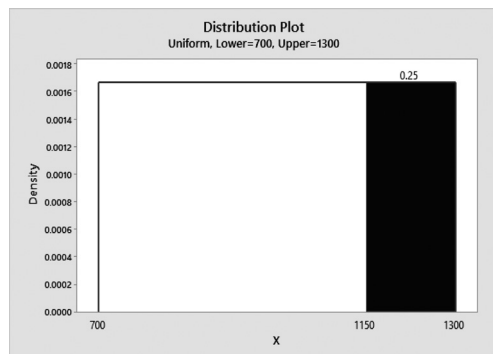
$$P(X \leq k) = \int_{x=a}^{x=k} \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_{x=a}^{x=k} dx. \quad (2.2)$$

Since it is assumed to be $1 - \alpha$, we have $\frac{k-a}{b-a} = 1 - \alpha$, or, $k = \alpha a + (1 - \alpha)b$. That is, $100(1 - \alpha)$ -th percentile of $U(a, b)$ is given by $x_\alpha = \alpha a + (1 - \alpha)b$. (2.3)

The equation (2.3) can also be written as $x_\alpha = b - (b - a)\alpha$ which is linear in α . Because of the location symmetry of the distribution, the mean is the same as the median which is $(a + b)/2$. By the same token the 25th and 75th percentile can simply be calculated by $0.5(a + \mu)$ and $0.5(\mu + b)$.

Example 2.1 The minimum and maximum of salaries of the employees per week of a company are given by \$700 and \$ 1300 respectively. Determine the 75th percentile of the salaries by assuming that salaries follow a uniform distribution.

Solution: The minimum and maximum salaries are given by $a = 700$ and $b = 1300$. By using (2.2), the 75th percentile of salaries is given by $0.25a + 0.75b$, or, $0.25(700) + 0.75(1300) = 1150$. Since the average salary is $\mu = 0.50(700 + 1300) = 1000$, the 75th percentile of salary can also be simply calculated by $0.5(1000 + 1300) = 1150$. It is shown below by using a computer package Minitab.



Since $X \leq 1150 = 0$, implies $P(X > 1150) = 0.25$, it is a tradition to color the side with less probability but the value 75th percentile is denoted by $x_{0.25} = 1150$. Obviously, every value in the horizontal axis is a percentile. The naming of it depends on the probability beyond it.

2.2 The Uniform Distribution with Mean and Variance

Since the normal distribution is identified by its mean and variance, we define uniform distribution with mean and variance. Then we will find percentiles.

The mean and variance of the distribution $U(a, b)$ is given by

$$\mu = \frac{a+b}{2} \text{ and } \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \quad (2.4)$$

respectively. We will be denoting the distribution above by $UNI(\mu, \sigma^2)$ where μ and σ^2 are given by (2.4). From (2.3), we have

$$b + a = 2\mu \text{ and } b - a = 2\sqrt{3}\sigma \text{ so that}$$

$$a = \mu - \sqrt{3}\sigma \text{ and } b = \mu + \sqrt{3}\sigma. \quad (2.5)$$

Example 2.2 The average and variance of salaries of the employees per week of a company are given by \$1000 and \$30000 respectively. Determine the 75th percentile of the salaries by assuming a uniform distribution.

Solution: Since the mean and variances are given to be $\mu = 1000$ and $\sigma^2 = 30000$,

it follows by (2.5) that the minimum and maximum salaries are given by $a = 700$ and $b = 1300$ respectively. By using (2.3), the 75th percentile of salaries is given by $0.25a + 0.75b$, or, $0.25(700) + 0.75(1300) = 1150$. Since the average salary is $\mu = 1000$ and $b = 1300$, the 75th percentile of salary can also be simply calculated by $0.5(1000 + 1300) = 1150$.

3. The Percentile of Uniform Distribution

The percentile of the uniform distribution is in terms of minimum and maximum value of the variable but that of normal distribution is in terms of mean and standard deviation. We felt students do not see a connection between the percentiles of the two distributions. An attempt is made in this section to express parameters of uniform percentile in terms of its mean and standard deviation. Since there is not much similarity between the probability integrals or other characteristics of these two distributions, we show a connection between the two distributions through percentiles. Interestingly, it has paved the way for accepting normal percentiles with the background of that of uniform distribution.

The integral in (2.2) involves parameters a and b . By making the transformation, $x = t + a$, we have

$$P(X \leq k) = \int_{x=a}^{x=k} \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_{t=0}^{t=k-a} \frac{1}{1-0} dt = \frac{1}{b-a} P(T \leq k-a),$$

where $T \sim U(0,1)$. Note that $j = t_\alpha$ is the $100(1-\alpha)$ -th percentile of $T \sim U(0,1)$, i.e., $P(T \leq j) = 1-\alpha$. Since $P(T \leq j) = \int_{t=0}^{t=j} dt = j$, we have $j = 1-\alpha$, or, $t_\alpha = 1-\alpha$. ^{$t=0$} Hence from (2.3), we have $x_\alpha = a\alpha + t_\alpha b$.

We observe that $T \sim UNI(0.5, 1/12)$ which is not matching with $Z \sim N(0,1)$. The minimum and maximum z -scores of any uniform random variable $U(a,b)$ are given by $-\sqrt{3}$ and $\sqrt{3}$ respectively. Interestingly, this proves that $Y \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ having mean $E(U) = 0$ and $Var(U) = 1$, i.e., $Y \sim UNI(0,1)$.

Result 3.1 Let $Y \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, or equivalently, $Y \sim UNI(0,1)$. Then the $100(1-\alpha)$ -th percentile is given by

$$y_\alpha = \sqrt{3}(1-2\alpha). \quad (3.1)$$

Proof. For $Y \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, we know that $E(U) = 0$ and $Var(U) = 1$, so that by (2.3), $100(1-\alpha)$ -th percentile is given by $x_\alpha = \alpha(-\sqrt{3}) + (1-\alpha)(\sqrt{3})$, which simplifies to (3.1).

Result 3.2 Let $X \sim U(\mu - \sqrt{3}\sigma, \mu + \sqrt{3}\sigma)$ or equivalently, $Y \sim UNI(\mu, \sigma^2)$. Then the $100(1-\alpha)$ -th percentile is given by

$$x_\alpha = \mu + y_\alpha \sigma, \quad (3.2)$$

where the y_α is the $100(1-\alpha)$ -th percentile of $Y \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

Proof. For $X \sim U(a,b)$, we know that $\mu = \frac{1}{2}(a+b)$ and $\sigma = \frac{1}{2\sqrt{3}}(b-a)$, then

we have $a = \mu - \sqrt{3}\sigma$ and $b = \mu + \sqrt{3}\sigma$ so that by (2.3), $100(1-\alpha)$ -th percentile for the uniform distribution $U(a,b)$, or, $U(\mu - \sqrt{3}\sigma, \mu + \sqrt{3}\sigma)$ is given by $x_\alpha = \alpha(\mu - \sqrt{3}\sigma) + (1-\alpha)(\mu + \sqrt{3}\sigma)$, which simplifies to $x_\alpha = \mu + \sqrt{3}(1-2\alpha)\sigma$, which simplifies to (3.2) by (3.1).

We observe that the percentile $y_\alpha = \sqrt{3}(1-2\alpha)$ of standard uniform distribution $Y \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ or equivalently, $Y \sim UNI(0,1)$ may easily be used to determine the percentile $x_\alpha = \mu + \sqrt{3}(1-2\alpha)\sigma$ of general uniform distribution $X \sim U(\mu - \sqrt{3}\sigma, \mu + \sqrt{3}\sigma)$ or equivalently, $X \sim UNI(\mu, \sigma^2)$.

In Example 2.2, we derived 75th percentile by using (2.3). Now we do it by using standard uniform distribution. The standardized scores of the minimum and the maximum salaries are $\frac{a-\mu}{\sigma} = -\sqrt{3}$ and $\frac{b-\mu}{\sigma} = \sqrt{3}$ respectively. By (3.1), the 75th percentile of standard uniform distribution $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, or, $UNI(0,1)$ is $y_{0.25} = \sqrt{3}(1-2 \times 0.25) \approx 0.87$. Then by (3.2), the 75th percentile of $U(\mu - \sqrt{3}\sigma, \mu + \sqrt{3}\sigma)$, or, $UNI(\mu = 1000, \sigma^2 = 30000)$ is given by $x_{0.25} = \mu + y_{0.25}\sigma \approx 1000 + 0.87 \times \frac{300}{\sqrt{3}} \approx 1150$.

The following table shows how the sliding coefficient $\sqrt{3}(1-2\alpha)$ of standard uniform percentile affects that of general uniform distribution. The last column provides selected percentiles of salaries related to Example 2.2.

100(1- α)-th percentile	α	$y_\alpha = \sqrt{3}(1-2\alpha)$	$x_\alpha = \mu + y_\alpha \sigma$
50 th percentile	0.50	0	0
75 th percentile	0.25	$\sqrt{3}(0.50) \approx 0.877$	1151.91
90 th percentile	0.10	$\sqrt{3}(0.80) \approx 1.389$	1240.58
95 th percentile	0.05	$\sqrt{3}(0.90) \approx 1.559$	1270.03
97.5 th percentile	0.025	$\sqrt{3}(0.95) \approx 1.645$	1284.92
99 th percentile	0.01	$\sqrt{3}(0.98) \approx 1.697$	1293.93
99.5 th percentile	0.005	$\sqrt{3}(0.99) \approx 1.715$	1297.05

Table 3.1

4. The Percentile of Normal Distribution

The most popular probability density function is the normal distribution. The probability integral for this function is difficult, and has been a topic of research for well over 100 years. We usually use a calculator or a normal table to calculate probability. While teaching service courses in statistics, we introduce uniform distribution and the normal distribution.

For a standard normal variable $Z \sim N(0,1)$, assume that the 100(1- α)-th percentile is given by z_α (say). It is defined by the integral

$$\int_{-\infty}^{z_\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \alpha. \quad (4.1)$$

The integral is more than a century old and is available in most books of statistics and even in the internet for values of α and z_α . The table is variously called Cumulative Probability Table, CDF (Cumulative Probability Distribution) or simply Normal Table. For a given z_α , the integral in the left hand side of (4.1) is called

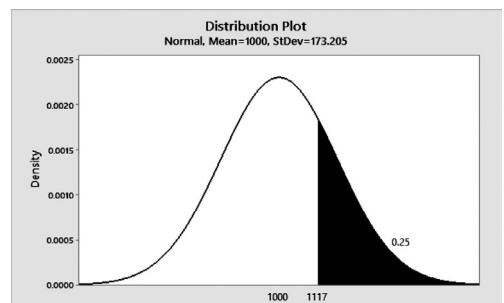
the normal probability integral which is evaluated to be α . But for a given α , the solution to z_α of the integral equation in (4.1) is called the 100(1- α)-th percentile of the standard normal distribution with probability density function the same as the integrand in (4.1).

For a normal distribution $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, the 100(1- α)-th percentile $k = x_\alpha$ we have $P(X \leq k) = 1 - \alpha$ which can be changed to $P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{k - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \alpha$.

Then $z = \frac{k - \mu}{\sigma}$ is the 100(1- α)-th percentile of $X = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$. Then by our notation, $\frac{k - \mu}{\sigma} = x_\alpha$ or, $x_\alpha = \mu + k\sigma$. That is, the 100(1- α)-th percentile of $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ is given by

$$x_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma. \quad (4.2)$$

In Example 2.2, we derived 75th percentile of salaries by using (4.1). Now we do it by using standard normal distribution. The 75th percentile of salaries is given by $x_{0.25} = \mu + z_{0.25}\sigma \approx 1000 + 0.67 \times \frac{300}{\sqrt{3}} \approx 1116.05$. It is shown below by using a computer package Minitab.



The left side of the uniform distribution may also be colored maroon and the right side white.

5. The Main Result

In (4.1), we observe that the percentile z_α of standard normal distribution $Z \sim N(0,1)$, may easily be used to determine the percentile $x_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$ of general normal distribution $X \sim N(\mu, \sigma)$.

In both cases of (3.2) and (4.1), percentiles slide around the mean with sliding factors z_α and y_α respectively.

A table is prepared below to see the difference of percentiles of standard and general distributions. Two commonalties of mean and variance provide a common footing to compare.

	Standard Uniform Distribution	General Uniform Distribution
Distribution	$Y \sim U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, or, $Y \sim UNI(0,1)$	$X \sim U(\mu - \sqrt{3}\sigma, \mu + \sqrt{3}\sigma)$ or, $Y \sim UNI(\mu, \sigma^2)$
100(1- α)-th percentile	$y_\alpha = \sqrt{3}(1-2\alpha)$	$x_\alpha = \mu + y_\alpha \sigma$.
Mean and variance	0 and 1	μ and σ^2

Table 5.1

	Standard Normal Distribution	General Normal Distribution
Distribution	$Z \sim N(0,1)$	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$
100(1- α)-th percentile	z_α	$x_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$
Mean and variance	0 and 1	μ and σ^2

Table 5.2

The 3rd and 4th column of following table shows how the percentiles of standard normal distribution affects that of general normal distribution.

100(1- α)-th percentile	α	z_α	$x_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$
50 th percentile	0.50	0	1000
75 th percentile	0.25	0.67	1116.05
90 th percentile	0.10	1.282	1222.05
95 th percentile	0.05	1.645	1284.92
97.5 th percentile	0.025	1.96	1339.48
99 th percentile	0.01	2.326	1402.88
99.5 th percentile	0.005	2.576	1446.18

Table 5.3

In passing, we remark that the 95th percentile of standard normal can be remembered as $z_{0.05} \approx \sqrt{3}(0.95) \approx 1.645$ which is approximately the 97.5th percentile of uniform distribution $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ with mean 0 and standard deviation 1. We also remark that $z_{0.13} \approx 1.13$.

In Example 2.2, given mean and variance of salaries, we derived 75th percentile of salaries assuming that they follow a uniform distribution. We now do it

by assuming normal distribution. It is known that the 75th percentile of a standard normal distribution $N(0,1)$ is given by $z_{0.25} \approx 0.67$. By using (4.1), the 75th percentile of a general normal distribution $N(\mu, \sigma^2)$ is given by $x_{0.25} = \mu + z_{0.25}\sigma \approx 1000 + 0.67\left(\frac{300}{\sqrt{3}}\right) \approx 1116.047$.

6. Conclusion

In Table 5.1 and Table 5.2, we have presented percentiles of general uniform and general normal distributions with their standard counterparts. We believe that this parallelism will motivate and make the students confident about determining normal percentiles by using Standard Normal Percentile Table.

References

- Bryc, W. (2002). A uniform approximation to the right normal tail integral. *Applied Mathematics and Computation*, 127, 365-374.
- Derouet, C and Parzysz, B (2016). How can histograms be useful for introducing continuous probability distributions? *ZDM Mathematics Education*, 48, 757-773.
- Johnson, N.I., Kotz, S., and Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions. 2nd edition. New York: Wiley.
- Lin, J.T. (2009). Pocket-calculator approximation to the normal tail. *Probability in the Engineering and information Sciences*, 4, 531-533.
- Marsaglia, G (2004). Evaluating the normal distribution, *Journal of Statistical Software*, 11 (4), 1-11
- Shore, H. (2005). Accurate RMM-based approximations for the CDF of the normal distribution. *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 34, 507-513.
- Choudhury, A. (2014). A Simple Approximation to the Area Under Standard Normal Curve. *Mathematics and Statistics* 2(3): 147-149, 2014, DOI: 10.13189/ms.2014.020307



Portrayal of Submission and Defiance of Women in Literature by South Asian Women Writers

K.P.S. Subhani

Abstract

As the culturally bound ethics have restricted and limited women's freedom and autonomy as long as the history remembers, the South Asian women writers have portrayed this very fact in their novels of the struggles and criticisms they went through in becoming autonomous, creating a voice for themselves and acquiring the power to take decisions for their futures on their own. Women's literature has created a safe space for them to express this social suppression and in the last few decades of twentieth century, the approach to women's literature in South Asia has remarkably portrayed the rebellious and non-silent nature of South Asian women in their domestic territories against the anomaly of submission imposed on them.

K.P.S. Subhani

MA (Masters in Conflict and Peace Studies), BA in English (University of Colombo, Sri Lanka) TESOL / TEFL qualified. Government school teacher. susupathirana@gmail.com

Keywords

South Asian Women, Suppression, Discrimination, Defiance, Vulnerable, Autonomous, Identity

1. Introduction

Growing up as a minority has long been an oppressive, biased, politically degenerating issue in South Asian novels. The second-generation immigrants are still struggling with the biases and with its remnants. (Narula, 2019) Simone de Beauvoir's articulation of patriarchy for South Asian women on their position of

the society seems quite appropriate as the woman is differentiated with reference to man and not the man with reference to the woman. She is and has always been the inessential and accidental or the vessels of men, as producers of heirs whereas he is the "absolute" part of existence. (Beauvoir, 1968) It should also be noted that for a long period women in South

Asia have also inculcated their beliefs in this social construction.

The augmented number of women writers in the recent decades who engaged in South Asian literature is inspiring and it has pioneered being role models for other women as put by a UK biased blogger “having been born and brought up here, I had no idea that there was South Asian writing by people like me. I found that I had had similar experiences as someone else which was empowering for me”. (Narula, 2019)

As two folded as these writings are; if you live in South Asia, these writings are empowering but if it is in the West, it can affect differently. Most of these writings display gender oppression, cultural, religious biases and issues of women being considered as a minority. This as a baggage has been dragged to the West and cultural practices that don't fix in a frame are considered oppressive.

Oppressive cultural practices of the East for example: prayers used to flourish harvests, avoid droughts, child marriage, female genital mutilation (FGM) have subjugated women under the control of patriarchy for decades (Narula, 2019). There's a myth woven around the idea that marriage is needed to complete a woman. This myth also continues to the western narrative. South Asian women

writing often romanticize their husbands' patriarchal behaviours as sacrifice and devotion, often questioned by the west to be unequal treatment towards women. All the efforts done for women's emancipation have come to nothing compared to how eastern women are being manipulated in the guise of culture.

Little or No Place for Women

As portrayed by many writers there's a pragmatic division of space in the South Asian households for women. South Asian literature often testifies for women playing a role in moulding identities in the physical structures of households. (David, 1995) How women were positioned depicted by David N. Benjamin, has stated five concepts of the home that has been altered over the years: a lexical symbol, as a descriptive term, a juridical term, as a condition of psychiatric research related to home sickness and as an empirically adopted cultural phenomenon. (David, 1995) In 1977, Rama Mehta's novel, “Inside the Haveli” talks about the harsh segregation of women and men in a joint family system and about the subservient nature of women in Purdah; a clothing material they used to wear around their heads.

This story is woven around a newly married woman named Geeta; the daughter-in-law for the only heir of the

Jeewan Niwas; the haveli or the mansion of which Geeta, the protagonist unfolds to the reader about the life in “Haveli: the mansion”. She soon finds herself limiting her physical horizons, restricted by any kind of visit to the other havelis confining her only to the haveli she’s married to. (Lisa, 2002) This particular novel was written when South Asian women writing was almost in its primary stages. Yet this novel gives a vital indication of how the space in haveli was gendered. There were definite rules for women and men alike in living together as a joint family; of which the chambers are commonly divided and simultaneously centred by a compound where secrets couldn’t be kept at all. Even servants had a role to play. So, everyone knew everyone else’s business.

For many newly married women whose new home becomes the home of the in-laws, suffer oppression at home, having no option to run back to their natal homes. The loneliness, exploitation, and violence they often face under the in-laws had become concretized. Women’s powers entirely depend on the connection to their men. The distance and inaccessibility from men have been taught to women at an earlier age and even in their absence, men have the power to reinforce the authority. This particular scenario is known as “everyday map of patriarchy”. (Rose, 1996) The word “home connotes

a space for patriarchal hierarchy and gendered self-identity”. (Lisa, 2002)

This tradition of shrinking the identity of women has been portrayed by Bulbul Sharma who, in her novel ‘My Sainted Aunts’, writes about Indian Women, taking them as central characters, whose hardships are stressed upon a daily basis among which widowhood, obedience to male chauvinism, child marriage and issues as such are discussed. (Sharma, 1992). These stories depict how women are aware of the patriarchy even in her body language, ready to jump off and serve others and listens to the orders of others, trying to be of any use to the other family members as they feel the urge to earn their place everywhere they go.

In another story “Trials of a Tall Aunt”, Sharma writes about a woman named Roopbala who is taller than her husband and for that very reason, she is being criticized and her very sight makes her husband annoyed. She avoids his abuse by trying to hide in the shadows, remaining unseen yet simultaneously trying to fulfill her duties as a wife. (Lisa, 2002)

On the contrary, there are those women who do not wish to be subservient. Anjana Appachana in one of her stories talks about the agony of a woman who tried to fit into the role of the daughter-in-law, tried to shrink her social horizons

by abandoning her practising of the Sitar, not going out with friends and unwillingly tolerating the frequent invasion of her bedroom by other members of the family, blocking the way for her and her husband to even engage in a private discussion, finally leading her to leave the house. Appachana is one of the South Asian women writers who emphasized that troubled marriages may end up broken if enough personal space and autonomy weren't given for the newlyweds. In most South Asian households, personal space for a married couple isn't given the priority and even a closed door in a house can be subject to rejection and severe criticism. (Appachana, 1992)

Submission and Defiance

The previous section talked about the women's limited place in the contemporary South Asian novels. Many writers live in their autonomous liberty yet in their writing they attempt to show the social handcuffs put on women in their communities. Women have been victims even though their characters occupy the lead roles in the novels, this very victim quality has been very consistent in this genre. South Asian women's literature consists of the depictions of the suffering undergone by women in Asian households. Though most of the writers honour the resilience of South

Asian women, only a few writers have actually portrayed the female protagonists as the "natural victims" who tolerate their respective cultural ills.

The following discussion of selected two novels representing the South Asian literature, talks about how some women have chosen to live according to the ways in which pleases them no matter that they run contrary to the ordinary lifestyle of other South Asian women. These norms are challenged criticized upon and illustrate about the womanhood, wifehood and motherhood which are rigidly reinforced onto the women in these households. Below shown are the synopses of the two novels. (Lisa, 2002)

Difficult Daughters – Manju Kapur

Written in 1998, the story reveals about a woman called Virmati (Viru) who was the eldest of a family of eleven siblings who had been promised in marriage for a family of a similar respect to be sent for an extended family. Things get drastically changed when she fell in love with her college professor, and she eventually refused to marry the man she was promised in marriage. Viru decided to commit suicide but at the strict hands of the parents she was put in confinement at home yet under the caring of her family members. Later on, she was sent for her further studies to Lahore and she again

started her clandestine relationship with the professor. She found out that she was pregnant and the professor who was already married and had one child, wasn't ready to accept her in marriage. She went for an abortion and after her studies she started working as a teacher where she resumed her illicit relationship with the professor. The revelation of her affair by the employer cost her job and desperate of losing her, the professor married her. She was his second wife, and she wasn't accepted at the house by his first wife. Things became difficult and eventually the first wife left the house and Viru lived with the children from both marriages at home. (Kapur, 1998)

What the Body Remembers – Shauna Singh Baldwin

We encounter a village girl named Roop of Sikh caste and was left alone at home with her poor father having no money to send her in marriage to another man. She gets married to a landlord who comes in search of a second wife whose first wife was barren. Little did she know that the first wife dislikes her and wants her children to be given over after their naming ceremony. She fled back to her village when she suspected that she was being poisoned. Her husband arrived looking for her and promised separate households for the two wives and later

on as the first wife was diagnosed with tuberculosis, Roop was assigned the head of the house. She lived with her husband and children thereafter. (Baldwin, 1999)

As the two stories are revolving around the same subject matter, we are convinced how South Asian women live with fear for as long as they live. Their lives have been ruthlessly manipulated by the concept that without a marriage they'll be left undervalued, criticized and ignored. Therefore, the sole and ultimate attempt of almost all these women is to please her husband and to be subservient in whatever the duties they perform.

In the latter story of Roop, it is made clear that she lives with constant fear of being dispossessed at every phase in her life; when she was young, she was in fear of not belonging to a place if she's not married, she was afraid that her children could be sent away from her as a mother, she was afraid of being poisoned by the first wife of her husband and this fear of dispossession continues. This quality of being dependent on someone keeps her submissive and self-sacrificing to secure her place everywhere she goes which is a constant struggle. The character of Roop can perhaps be that of who is manipulated by the society, yet on the contrary, Virmati in *Difficult Daughters* is someone whose life takes a different stance. These two

stories represent the twentieth century South Asian Women's literature, and both our protagonists are defiant to the social norms they encounter although slightly varied from the circumstances they face. When Roop gets married to secure her life, Virmati's approach to marriage drastically alters from that of the purpose. However, they both pursue what they thought was the best for themselves. Virmati is rebellious, fights for her love for the professor which pretty much differs from what Roop was doing who was looking for a survival through marriage. Virmati on the other hand is radical and her results are the outcome of her actions of getting into an illicit relationship with an already married man. Her defiance was not generally focused on marriage but not letting others know that she wanted to wait for the professor she fell in love with. Thus, her family believed that she didn't want to get married at all when in reality she badly wanted marriage with the person she wanted. It was her mother who got outraged; considered her decisions to be an insult for her family as marriage was accepted to be a necessity, not an option. Her father on the contrary wasn't outraged as the mother, he grieved in silence, and it was also him who encouraged the daughter to pursue education and to get into a career. Before India gained independence, the movement

of nationalism preached that their women getting into careers was a way of being rebellious and therefore shouldn't be allowed to. (Lisa, 2002)

As these novels portray the submission of women into those marital relationships, not exercising their freedom or surpass the restrictions on education and continuing to rather obey the patriarchal rules imposed on them have been discussed by the South Asian women writers. These writings reveal that this submission has become more like a habit or a lifestyle, irrationally adhering to whatever the limits were expected from them. Furthermore, this submissive nature is expected to be a virtue that a woman beholds. This very nature of going against the established norms; becoming disobedient and rebellious is shown as an anomaly to decorum, Asian tradition, and religions. These Asian women rationalise their degrading lives as the sins of past lives, thereby losing hopes of becoming their own redeemer. This menacing situation lets women suffer in silence and endure extreme forms of violence at the hands of in-laws and husbands rather than looking for resolutions. (Lisa, 2002)

In the above two stories, Virmati and Roop are portrayed as victims, yet they are not portrayed to be silent who do not struggle to gain some definite ground for

them. The main social ground for both of them is the home, their domestic territory. In the novels written by South Asian women writers, the urge of the new brides to claim the domestic territory is clearly portrayed through the need to establish for themselves a confirmed matrimony. However, this struggle engages actions like planting trees, displacing mothers-in-law which eventually enable the new brides to establish themselves in the household. The protagonists of these novels are deliberately created to be rebellious who are capable of challenging the norms of the society set out for women. However, with advent of political, educational and economic changes, the 21st century have brought forth brave south Asian women who fearlessly stand out from the crowd for the due recognition they deserve. The influence of “westernization” as a result of most South Asian countries being British colonies have undoubtedly paved the way for women to become as equal as women. Now we can see that there are numerous organizations in action representing the voice of women.

The following discussion talks about how specifically Indian women have emerged in the decades of 1980s and 1990s from that of which they went through earlier from Shashi Deshpande’s novels.

Shashi Deshpande’s Fictional Women.

Shashi Deshpande is someone who was born in India and wasn’t educated abroad; thus, she herself declares “My background is very firmly rooted here. I was never educated abroad, my novels...are just about Indian people and the complexities of our life” (Deshpande, 1999) affirming the fact that she differs from those writers who were diasporic. She has authored eight novels out of which six discuss similarly about the same subject matter. These novels are written as a growth of a series not as a sequel but developing as the same subject matter.

Following are the synopsis of some of them.

The Binding Vine – (1993)

The protagonist Urmila, whose daughter died very young, lives with her mother and son. The husband is often away from home for work. In the process of her recovery from the death of her baby daughter, she finds Shakutai, a poor woman from labour caste with whom the sub plot of the novel continues. Her elder daughter Kalpana was raped by her uncle and after getting to know this, Shakutai’s sister commits suicide by drenching herself in kerosene and setting herself on fire as it was her husband who did this. Urmila also encounters a collection of poetry of her mother-in-law who has also

died young, and she encounters the tales of other women and empathise with them to cope with her own grief. (Deshpande, 1999)

A Matter of Time – (1996)

Gopal, the father to three daughters and husband of Sumi, had to leave them for work for a remote area of the town after which the wife and the daughters go back to their ancestral house to live. He engages in a low-paid job and doesn't make time to visit the family often. The extended family of Sumi doesn't like the separation and takes up chances to communicate with Gopal but fails. Several secrets from previous generations are also revealed. At the end of the story, Sumi and her father were killed in an accident and the three daughters start living on their own. Finally, Gopal realizes that he holds no place for him in the family. (Deshpande, 1999)

Small Remedies – (2000)

Madhu, the protagonist of the story had recently lost her son of twelve-year-old and she finds it difficult to live with her husband with the emotional estrangement she was going through. She eventually moves to Bombay to work as a writer who is writing the biography of Savitribai who is related to her past when they both lived as neighbours. As she takes up writing as a career, she realises the person whose

life is narrated is only revealed partially to her and in the same way Madhu also cuts herself from emotional baggage from the family ties and starts living the life in her own way to save herself from the pain she couldn't endure. She continues to live among the people who brings contentment for her and accepts that as her future. (Deshpande, 1999)

Deshpande's Protagonists

Deshpande makes a point that all her women characters represent the average, middle class of India, the milieu she herself represents as the middle class is the largest section that the Indian society consists of. All her women protagonists are married, middle aged, not physically attractive or pretty but highly intellectual, diligent, well-read, and competent. Deshpande's women are sensible, but they are culturally confrontational and challenge the societal norms put on them against the fact that men desire from their women not to think and not to burden themselves with thinking. Most of these heroines have fought against or have been rebellious over an adult women character in their stories by going against the norms. Another salient feature in her heroines is that they are fond of self-observation, being observant into smaller details of their lives. (Lisa, 2002)

Conclusion

Most of the protagonists of South Asian women writers, although submissive to patriarchy and obedient in the household for their so-called husbands, have in some way or another struggled to become more independent at their domestic territory; in trying to secure a place for them or becoming the matriarch of the household. Over the decades the South Asian women's literature has showcased the eventual increase of these common, ordinary middle-class majority of women, to be more defiant and rebellious in seeking autonomy in their lives as discussed in the above-mentioned novels and how it has paved ways for women to reign as they wish in any field of the society with the advent of political, social, and educational changes and reforms that came across with the western influence. The subservient nature of women and the need to adhere to it have long restricted them from exploring their true potential and what they are capable of achieving just as their men did.

References

Anjana Appachana, *Incantations and Other Stories* (New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1992)

Bulbul Sharma, *My Sainted Aunts* (New Delhi: Indus-HarperCollins, 1992) 134

David E. Benjamin, *The Home: Words, Interpretations, Meanings and Environments* (Aldershot, UK: Avebury, 1995) 295-296

Lau, Lisa (2002) *Women's voices: the presentation of women in the contemporary fiction of south Asian women*, Durham theses, Durham University.

Manju Kapur, *Difficult Daughters* (Kent: Faber & Faber, 1998) 15

Narula, Surina. "Women in South Asian Writing." *The Punch Magazine*, The Punch Magazine, 31 Oct. 2019, <https://thepunchmagazine.com/the-byword/non-fiction/women-in-south-asian-writing>.

Rama Mehta, *Inside the Haveli* (London: Women's express, 1977) 170.

Rosemary Marangoly George, *The politics of Home. Postcolonial Relations and Twentieth Century Fiction* (Cambridge: Cambridge UP:1996) 16

Shashi Deshpande, in the Afterword by Ritu Menon, 1999. *Matter of Time* (1996, New York: Feminist, 1999) 248

Shauna Singh Baldwin, *What the Body Remembers* (London: Doubleday-Transworld, 1999) 85

Simone de Beauvoir, *The Second Sex* Trans. and ed. H.M. Parshley (London: Jonathan Cape. 1968)



Male 'I' and the Trope of Failure in Shashi Deshpande's *The Dark that Holds No Terrors*

Dr. Sabreen Ahmed

Abstract

The paper focuses on Shashi Deshpande's first novel 'The Dark that Holds No Terrors' which demystifies the codes of a man's superiority in the Indian social milieu. Shashi Deshpande here probes into the failed ego of a male subject through Manu, whose sadistic impulses are instrumental in shattering the very edifice of a romantic marriage. Suffering from inferiority complex Manu's subjectivity offers relevant scope for making a study in split personality and sadistic impulses. Manu's degeneration into sadomasochism starts with his wife Saru's increasing success and his fading talents due to the huge gap between their financial achievements and imbalanced responsibilities. The novel tries to suggest that the myth of the authoritative male figure is detrimental for the individual development of both the genders.

Dr. Sabreen Ahmed

Assistant Professor

Dept. of English

Nowgong College (Autonomous)

Nagaon, Assam,

782001.

sabreen54321@gmail.com

Keywords

Patriarchy, Gender role, Masculinity, Sadism

Introduction

Deshpande's first novel *The Dark that Holds No Terrors* demystifies the codes of a man's superiority in the social milieu. Shashi Deshpande here probes into the failed ego of a male subject through Manu, whose sadistic impulses are instrumental in shattering the very edifice of a romantic marriage. Suffering from

inferiority complex Manu's subjectivity offers relevant scope for making a study in split personality. As a reversal in the gender game Manu's degeneration starts with his wife Saru's increasing success in her medical profession and the fading of his literary talents to mediocrity. Before discussing in details the intricacies of the schizophrenic implications in Manu's subjectivity, certain observations with

regard to the failing traits of Indian masculinity has to be taken into account. Sudhir Kakar's observation on the Sita legend in *Intimate Relations: Exploring Indian Sexuality* locates the flaws of the Hindu imagery of manliness in Rama's character. Rama may have the traits of a "god-like hero, yet he is also fragile, mistrustful and jealous and very much a conformist, both to his parents' wishes and to social opinion" (Kakar 1981:66). Ashis Nandy reinforces a similar view of weakness in Indian masculinity in his essay, "Woman versus Womanliness in India: An essay in Social and Political Psychology". Here he states:

The concept of *adyashakti*, primal or original power, is entirely feminine in India. It is the male principle in the godhead, *purusha*, which is reliable but relatively passive, weak and secondary (Nandy 72).

In the same essay, he goes on to discuss the differences of Indian forms of masculinity in its proximity with the feminine principle in sharp contrast to the western tradition:

In India, unlike in many western societies, the softer forms of creativity and the more intuitive and introspective styles of intellectual and social function are not strongly identified with femininity. Nor is

masculinity that close linked to forceful, potency-driven, 'hard' and 'hardheaded' modes of intrusive behavior. Sex-role specific qualities here are differently distributed. In fact the concept of potency in Indian high culture has always had a private, introversive quality about it. (Nandy 75)

Thus Deshpande's portrayal of weak male subjects is not outside the cultural realm of her social milieu. The inhibitions and apprehensions regarding the sexual behavior of Indian couples are depicted in Saru's reaction to Manu's sadistic sexual aggression. Manu's abnormal sexual behavior is the outcome of a false attempt to exorcise power and perpetuate dominance over his spouse who is socially and financially much above him in status. Here marital rape for Manu acts as an instrument to exhibit his lost strength, a convenient façade to falsify the decreasing levels of his potency. Schizophrenic impulses can be registered in Manu's subjectivity because his normal behavior at day with his wife shows no sign of any repercussions of his monstrous act at night, which is further aggravated by Saru's reticence to the whole issue. Thus the omniscient narrator describes:

It was part of the same pattern that had mystified her from the day it

had began....his cheerfulness the next morning, his air of being his usual, the complete total normality. She had almost given up trying to put the two men together, the fearful stranger of the night, and the rather pathetic Manu of other times. But it never ceased to frighten her, this dichotomy. (*The Dark*, 96)

Saru was the dual victim— first of Manu’s schizophrenia, and secondly of her apprehension in disclosing the matter. Talking about the latent nature of sexual problems in Indian culture, R. Mala in her essay “Sexual predicament and ShashiDeshpande’s Women” says:

The problem in the Indian sexual panorama is that has been sex has been branded as a taboo and the discussion in it in the public is avoided. In spite of the openness of our ancestors, who chose temple walls as excellent repositories of sexual mudras, very few people particularly women, are willing to dilate on their sexual problems if any. The heroines of Deshpande face the same situation in their sexual relationships with their husbands... Saru’s silence against her sexual predicament only reveals the modern women’s dilemma— of knowing the psychological nature of the problem

but hesitant to talk about it. (Mala. R, p.53-54)

Saru was silent because she too understood that it was her success which became the yardstick to measure Manu’s failure. Manu in his youth was a brilliant student of English literature, and had the potential to be a promising poet and playwright. Manu with the “aura of distinction” about him as the effective Secretary of the Literary Association, Debating Union and Dramatic society was compared to none other but the romantic poet Shelley. It was this image of a “superior, superhuman male” that Saru adored and got married to before the completion of her graduation. But once the feminine ‘I’ in Saru moved towards recognition as a lady doctor she overreached the male ‘I’ of her low salaried husband Manu, a lecturer in a third rate private college. Manu’s insecurity is revealed by Saru in the following words:

...when we walked out of our room, there were nods and smiles, murmured greetings and *namastes*. But they were all for me, only for me. There was nothing for him. He was almost totally ignored... the human personality has an infinite capacity for growth. And so the esteem with which I was surrounded made me inches taller. But perhaps, the same thing that made me inches taller

made him inches shorter. He had been the young man and I his bride. Now I was the lady doctor and he was my husband.

$a+b$ they told us in mathematics is equal to $b+a$. but here $a+b$ was not, definitely not equal to $b+a$. it became a monstrously unbalanced equation, lopsided, unequal, impossible. (*The Dark*, 36-37)

Masculinity in India is nourished with the images of suffering and subdued woman who can be easily dominated. The role of women as the mother-protector, the inspirer and the motivating force, as the object of desire, weakling and dependent on men tends to magnify men's stature by contrast. Virginia Woolf has remarked in *A Room of Ones Own*:

Women have served all these centuries as looking glasses possessing the magic and delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size.

Though the plot concentrates on Saru's perspective keeping her husband in the background, yet his sadism jeopardizes her identity within the enclosures of patriarchy. Patriarchy defines the hierarchical structure of marital roles which in case of Manu is inverted. Saru

acknowledges this in the following interior monologue:

Don't ever try to reverse the doctor-nurse, executive-secretary, principal-teacher role. It can be traumatic, disastrous. And I assure you, it isn't worth it. He'll suffer, you'll suffer and so will the children, women's magazine's will tell you that a marriage should be an equal partnership. That's nonsense, rubbish. No partnership can ever be equal. It will always be unequal, but take care if it's unequal in favour of your husband. If it tilts in your favour, God help you, both of you. (*The Dark*, 137)

The binary of husband as 'provider and protector' versus wife as 'recipient and protected' is reversed in Manu-Saru relation which makes Manu insecure. Premila Paul in her essay "*The Dark holds No Terrors: A Woman's search for Refuge*" rightly suggests that there are three problematic incidents that are frequently evoked by Saru from her bitter memory in a fragmentary fashion in the first three sections of the novel. These three incidents regulate and even control Saru's happiness. The first one is Saru's interview for a special issue on career woman brought out by a woman's magazine. The interviewer's casual query

put to Manu— “how does it feel when your wife earns not only the butter but most of the bread as well?”(182)— undermines Manu’s confidence totally. His sense of insecurity starts with the explosion in the nearby factory. The lover in him dies when the neighbors wake up to the fact that Saru is no ordinary housewife but an important figure in the face of a doctor. Unable to come to terms with the fact that he is a failure in life, Manu lets his wounded male pride manifest itself in the form of sexual sadism “the hurting hands, the savage teeth, the monstrous assault of a horribly familiar body.” (102) Gerda Learner rightly posits that men punish women by “ridicule, exclusion or ostracism” if they attempt to interpret their own roles. Saru internalizing Manu’s self-hatred thus remarked:

We belong to the same caste really. Both of us despise ourselves. What he does to me, he does it not so much because he hates me, but because he hates himself. And I... I hate myself for letting him do it to me than I hate him for doing it to me (*The Dark*, 8).

Manu’s schizophrenic tendencies— as a monster at night and charmer at day, is basically capital driven. His failure to prove his niche in the literary field also led to his stagnancy in a low paid job in a private college. He never hoped to join a

salaried job, but he was forced to do so by Saru who was still nascent in her medical profession when their first child Renu was born. Devastated mentally by the sadistic attacks of Manu, Saru even thought of giving up her work to give more time to her husband and children. But Manu rejected the idea because he couldn’t imagine a life without the luxuries made possible by Saru’s earnings. Making a clear confession of his low financial capability he remarked:

On my salary? Come on Saru, don’t be silly. You know how much I earn. You think we can live this way on that?... can you bear to send the children to a third-rate school? To buy them the cheapest clothes, the cheapest of everything? To save and scrape and still have nothing after the first few days of the month? No Saru there is no going back .We have to go on? (*The Dark*, 81).

Showing a complete façade in his actions, that day he behaved with Saru as a doting husband like the early years of their marriage cajoling her with tender words and silly diversions of mind like the offer for a movie. This shows Manu’s inherent duality of nature— first, his sluggishness to accept challenges in life and at the same time his inability to accept the Status Quo as an inferior to his wife. The hideousness

of Manu's subjectivity is concealed behind a masqueraded self in his groomed outer demeanor— a stylish beard to add a little more to his mask of normalcy as Saru perceived. Even his maniac strength during his sexual attacks was nothing but a sham to manipulate his gradually increasing impotency. Deshpande in the position of an omniscient narrator describes Manu's first sadistic attack in the following words:

And he began what was then for them a peculiar kind of love-making, with something in it that set it apart from all their other times together. It was not just that he was more intense, with nibbling little kisses interspersed with long devouring ones that so that she could scarcely breathe. It was the feeling that he was whipping himself on, trying to arouse himself to some piece of excitement that yet remained beyond him. For when she felt him against her, she knew there was nothing. It was a sham. And something about it sickened her... For the first time in their years together he couldn't go on. At last he gave up and fell back in his place. (*The Dark*, 86)

It is precisely because of his failure in all aspects of life that led to Saru's hatred for him, and she sought refuge in her

father's house as a means of escape from her conjugal hell. Sarita had alienated herself from her parents for many years because of her inter-caste marriage, only to come back after her mother's death. It is here living with her father and Madhav, a distant relative that she comes in terms with the facts of her life and begins her process of self-introspection.

When the novel opens, unable to solve her marital crisis, Saru seeks a temporary refuge in confrontation with her father after a gap of fifteen years. As a recurrent trope in Deshpande's novel's the father- figures are shown to be more liberal and progressive in relation with their daughters while the mothers fully cooperate in the ideological mechanism of patriarchy. Saru's relation with her mother following the accidental death of her kid brother Dhruva was totally embittered because the latter accused her for Dhruva's death by drowning. Though Saru's father never blamed her directly for Dhruva's death, yet he never tried to intervene in breaking the barrier that separated her from her mother. Returning back after so many years Saru was surprised to see her father fully in control of the household chores in Madhav's company, which had earlier remained in the sole domain of her mother. Deshpande describes his new role after his wife's death in the following words:

He had always been so much the man, the master of the house, not to be bothered by any of the trivials of daily routine. And yet he seemed comfortable in this new role, as if his earlier inactivity had been a giving-in to his wife's ideas, nothing to do with himself. (*The Dark*, 20).

Deshpande exhibits no melodramatic reunion between father and daughter. Saru's father had always known about her whereabouts yet he had never attempted any reconciliation with her. Moreover she was not even informed about her mother's death by cancer. Nevertheless he didn't rebuke her in her return. When he showed a kind of indifference in enquiring about her children, she was first angered but soon realized her own position where there was almost no scope for any expectations. Sharing the commonality of weak masculinity in Deshpande's male subjects, Baba inspite of his weak will was the only repose of strength left for Saru:

Perhaps she had known even then that he was feeble. No worse than that he was a non-entity and that did not matter. And yet he had battled on her behalf once. (*The Dark*, 29)

Though Saru's father didn't take much interest in her studies in her school days, yet he was never a staunch patriarch for

he allowed her the freedom to choose a profession for herself. Infact, it was the only instance when he stood firm against his wife in defending Saru's choice for a medical profession rather than forcing her to go for a marriage of their choice. Inspite of the feebleness in his subjectivity, her father adopts the role of a confidant in guiding her through her marital crisis. Despite the gender gap between them, Saru could open up to her father about the sadistic attacks of Manu which ruined her marriage. It is he who offers her sympathy, understanding and advice against her escapist routes. He persuades her to replace a sense of self-blame and grievance with the investment in the present in advising her to face facts rather than running away from them. The male 'I' in Baba breaks his overwhelming reticence and speak ups his own guilt consciousness of escaping from things which could have been solved through discussion:

Do you know Saru I often feel sorry that we left so many things unsaid, your mother and I. when she lay dying I wanted to ask her... would you like to meet Saru. Sometimes I think she might have said "yes". But I never did silence had become a habit with us. Now go on, tell me. Tell everything. (*The Dark*, 199)

His realization of his own guilt in keeping silent helps him in persuading Saru to discuss her problems with him. When Saru decided to go away from her father's place at the news of Manu's arrival, Baba made all his efforts in asserting his lost authority in dissuading her from her decision of avoiding her husband. Struggling to be tenacious and persistent he implored her:

Are you scared of him?... Give him a chance, Saru. Stay and meet him. Talk to him let him know from you what is wrong... Don't turn your back on things. Turn round and look them. Meet him. (*The Dark*, 216)

Baba made a desperate attempt to gain control over things which were falling apart in their lives because of his hitherto indifference to his daughter's problems. Realizing Saru's emotional entrapment to her painful past, her father tried hard to shake her out of her traumatic nostalgia:

...your mother is dead. So is your brother. Cant you let the dead go?... They can do nothing. Why do you torture yourself with others? Are you not sufficient for your own life? Its your life isn't it. (*The Dark*, 217)

Saru's father was a failure initially in holding his family together, and initiating reconciliation between mother and daughter, however, finally he succeeded

in convincing Saru to wait for Manu. The narrative closes with an open ending; nevertheless, there is some hope for the reader that perhaps there is an end to Saru's crisis, by the aid of her father.

Two other examples of failures of masculinity are exhibited by the marginal characters Boozie and Padmakar. They pose as the supposed other man in Saru's life, but could give her no respite out of the angst of her conjugality. Boozie is the benefactor who helped Saru in climbing the stairs of her career graph. He was a kind of fairy godfather for Saru helping her all throughout— in getting work in a research scheme, passing her MD in less than two years, opening her own consultancy room, getting a loan and so on. Manu never expressed anything overtly, but it is needless to say that Boozie was a constant means of insecurity for him. Manu's reticence over the matter created complications for Saru, further she ironically hated Manu for overlooking her closeness with Boozie. There are direct suggestions of a façade behind Boozie's overwhelming masculinity in Saru's opinion about him:

He was precisely close to a woman's magazine hero... dark, rugged, handsome and masterful. Everything about him... his language, his accent, his stride, his pipe, his swift progress through the wards, his banter with

his patients... contributed to the aura that surrounded him. They were all props, I decided later, to help create and maintain the necessary image. (*The Dark*, 88)

There are suggested implications of impotency even behind the mask of robust masculinity in Boozie. Disgusted with her husband's sadism Saru in one occasion went up to Boozie in his home for help. But she only returned with the knowledge of an alternate self in him. The identity of the person who was with Boozie at that moment is kept as a mystery for the reader, but there are enough hints of his being homosexual in his constructed image of a Casanova to conceal from the world the truth of his personal life. Although he attempted to overwhelm Saru by his masculinity, she was astonished to find that there was nothing behind it. Thus she remarked:

He had always been so immensely discreet, never a look never a glance at the male students. The drama of interest in the pretty girls... Nothing effeminate about him in the way he dressed moved or spoke. It was something else... A nebulous aura of femininity about him, faked, spurious, and therefore all the more assertive. (*The Dark*, 98)

Another male subject in whom effeminacy can be traced is Saru's batch mate Padmakar, popularly known as Padma, "as if the feminine name Padma deprived him of his maleness". Padmakar like Manu was a failure in his ambitions; he failed in having a valid subject for research and thus could never complete his MD. Saru's friendly gestures towards him became a kind of obsession with him, and soon she realized that her calculation of making Padma an escape route against her loveless life was a mistake. Padmakar's marital position is completely different from Manu, as it was in conformation to the social conventions of having an intellectually incompetent wife confined merely to domestic chores. This irritates him and he grumbles before Saru:

My wife she can't talk about anything but servants and the children. And prices. I earn enough, but she is perpetually trying to economize. She never has her food until I go home and mine, she cooks just what I like, and she never calls me by my name. (*The Dark*, 132)

Padmakar being unsuccessful in his ambitions directs his frustrations towards his wife for being what she was and secondly to Saru for not giving him enough time to discuss his problems with her. This shows the attitude of a weak

male subjects' transferring of own blame upon the other as a therapeutic measure for his inherent failings.

The other most important male character in the plot is Dhruva, whose brooding presence haunts Saru throughout her life in spite of the bitter truth that he was dead. The circumstances of his death left a deep chasm between the mother daughter relationships. Saru grows up feeling insecure and unwanted as her mother showed a marked preference for Dhruva. Saru's mother being a victim of male child fascination blamed her daughter for Dhruva's death. Thus even Dhruva's absence as a non-person too creates an emotional crisis for the central protagonist, from which there is no cathartic respite until the close of the plot. Her father's accompaniment Madhav acts the role of a surrogate son to recreate the presence of Dhruva in Saru's psychic realm.

In this novel Deshpande explores the reversal of gender roles in a patriarchal society. What she tries to suggest is that the myth of the authoritative male figure is detrimental for the individual development of both the genders. Manu's sadism is an effect of the societal pressures of gaining a position over his wife which he fails to achieve. While for Padmakar the socially defined role which his wife plays is detrimental to his individual

growth as he could never treat her as an equal to discuss his professional crisis, and therefore blames her for his stagnancy. On a similar vein Saru's father because of his lack of authoritativeness suffers the guilt of the disintegration of his family. Infact the novel explores questions like "who is the victim and who is the predator? Are the roles so distinct so separate? Or are we each of us both?"(144). Continuing the trope of weakness in Indian masculinity in the plot Deshpande's central female protagonist further analyses:

There is something in the male... that is whittled down and finally destroyed by female domination. it is not so with a female. She can be dominated she can submit, and yet hold something for herself in reserve. As if there is something in her that prevents erosion and self destruction... does the sword of domination hold lethal only when a woman holds it over a man? (*The Dark*, 77)

As Deshpande suggests from the point of view of Saru, her brother Dhruva becomes "a creature full of terrors" as he "is dominated by two females", his over protective mother and his rival sister. While her father and Manu are reduced in status by their respective wives.

Works Cited

Deshpande, Shashi. *The Dark that holds no Terrors* (F. P Vikas, 1980) New Delhi, Penguin, 1990

Kakar, Sudhir. *Intimate Relations: Exploring Indian Sexuality*. (University of Chicago Press, 1989) New Delhi, Penguin, 2000

Lerner, Gerda, *The Creation of Patriarchy*, New York, OUP, 1986

Mala, R. Sexual Predicament in Shashi Deshpande's Women, *Indian Women Novelists*, Vol.5. Ed. R. K. Dhawan, New Delhi, Prestige 1991

Nandy, Ashis and Kakar Sudhir, *Culture and Personality* in Udai Parek, Ed. *A Survey Of Research In Psychology*, 1971-76, Part-1, Indian Council Of Social Science Research, Popular Prakashan, Bombay, 1986

Paul. Premila, *The Dark holds No Terrors: A Woman's search for Refuge Indian Women Novelists*, Vol.5. Ed. R. K. Dhawan, New Delhi, Prestige 1991

Woolf, Virginia, *A Room Of Ones Own*, New York, Harcourt Brace, 1929



Case Study Review and Modeling of In-house Training for Enhancing Professional Intelligence of College Teachers

Mahadi Hasan Bappy & Dr. Shamsiah Banu Mohamad Hanefar

Abstract

Besides many other factors for success, the quality teacher is the prime requirement for educational institutions to improve the knowledge level and performance of the students. Teachers' performance and professional intelligence are partly depending on the pre-service and in-service training given to them. In-house training programs for college teachers are found enabling them to transmit their responsibilities according to the required standard in their current job station. Following the case study review and secondary literature review techniques, this qualitative research is conducted to explore the effectiveness of in-house training to enhance the professional intelligence of college teachers in Bangladesh. Based on the number of previous researches, this study revealed the extent of improvement of different professional intelligent quotients of teachers through in-house training. It also tries to model a potential in-house training program for college teachers in the context of Bangladesh. In order to disclose the application, implication, and significance of in-house training, it reviewed a case study research grounded on an in-house training program for medical teachers in Nepal. Following the case study and other researches reviewed, this study finds that in-house training helps enhance teachers' professional intelligence through developing their spiritual, emotional, and intelligence quotients. Moreover, this study finds some benefits as well

Mahadi Hasan Bappy

Lecturer

Department of Economics

Government Brajalal College

Khulna

e-mail: bappyku@yahoo.com

Dr. Shamsiah Banu Mohamad Hanefar

Assistant Professor

Centre for Academic

Partnership & Engagement (CAPE)

University of Nottingham

Malaysia, Malaysia

e-mail: shamsiah.banu@nottingham.edu.my

as challenges to implement in-house training for college teachers in Bangladesh and tries to recommend probable ways to overcome those challenges. If a goal-oriented and activity-based personalized in-house training program is initialized, it can surely enhance teachers' professional intelligence and students' achievement in the colleges of Bangladesh.

Keywords

Case Study, Modeling, In-house Training, Professional Intelligence, College Teacher

Introduction

Preamble : Effective teaching, which is very often focused on students' learning and their achievement is a concern for teachers' all over the world. Focusing on teachers' skills and learning is also important because it is found that students' learning becomes more effective when their teacher has required learning resources and professional skills¹. So, teachers' performance is one of the primary importance and therefore, regular training for teachers' in service is being emphasized worldwide. A professional development program changes the classroom practice which leads to the change of learning outcomes to the students and ultimately changes the beliefs and attitudes on the professional performance of the teacher². The absence of continuous performance development programs like in-house training perhaps retard the professional development of teachers³. In this regard, to enhance

teachers' professional performance and motivation, in-house training for them cannot be underestimated. In this study, the role of in-house training for enhancing teachers' performance at the college level is explained based on the improvement of their Professional Intelligence Quotient. A study paper on the application of teachers' training programs held in Nepal is reviewed as a case study to reveal the application, implication process, challenges and ways to overcome the challenges of this type of training program in the context of a government college in Bangladesh. Finally, based on the previous studies, a model for in-house training is also prepared and suggested by this research for teachers' professional development.

Statement of the Problem : In-house training is one type of in-service professional development program where the charge and membership of the training program belong to within the institution⁴.

Arranging this type of training for the faculty members inside the college can play an important part to overcome all the institution-based problems including teaching-learning, professional, and any other organizational need required at that particular educational institution. Through in-house training, a college can train its staff according to the need-based state which ultimately develops students' performance effectively from teachers' development. Evans⁵ defines teachers' development as a process where their professionalism is supposed to be enhanced. Development of professionalism includes the holistic development of emotional quotient⁶, intelligence quotient⁷ and spiritual quotient⁸. Moreover, an effective and successful in-service or in-house teacher's training program must follow some guidelines. A successful teacher's education or training program should ensure engagement of teachers in teaching, assessing, observing, and reflecting; grounded in experimenting activities; collaborative and connected to teachers' professionalism; intensive, on-going and problems solving based⁹. Lengkenawati et al.¹⁰ gathered information and designed a model for In-house training that can improve the professional ability of teachers. In the context of government colleges of Bangladesh, a well-functioned

in-house training program for teachers is very rare in practice.

The Rationale of the Study : As a result of having an instructional and direct relationship with the students, teachers have demonstrable effects and a significant role in students' progress and treated as the source of encouragement for them¹¹. Quality of teachers' in any specific educational structure helps to attain positive outcomes in the educational institution. Teachers' quality is partially depending on the pre-service and in-service training given to them. Pre-service training for the teachers works to upgrade their knowledge, skills, performance, and effectiveness. Meanwhile, in-service training is important to reorganize them to new goals, train them new methods of teaching, prepare them for the updated curriculum and finally provide them information and skills on new learning fields¹². Studies found evidence that in-house training programs develop teachers' professional intelligence through improving Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ), and Intelligence Quotient (IQ) which results in achieving its general aims of enhancing teachers' performance at college. In this regard, this study explains the worth of teachers' professional development in the face of EQ, SQ, and IQ development by

arranging an in-house training program at the college level.

Research Objective : This study is conducted aiming at understanding the significance of in-house training for college teachers for enhancing their different professional intelligence quotients. Based on the previous cases reviewed, it has also put its light on modeling a holistic in-house training program for the college teachers of Bangladesh. In this regard, this study is intended to answer the following research questions:

1. To what extent an in-house training program enhances different professional intelligence quotients of the college teachers?
2. What are the benefits and challenges of implementing an in-house training program at the college level?
3. What is the potential model for an effective in-house training program for college teachers?

Literature Review

In-house Training and Teachers' Professional Development : Teachers' training directly focuses on the current responsibility of a teacher which aims at immediate goals to prepare them for new instructional responsibility¹³. Guskey¹⁴ defines teachers' professional

development (PD) as the process that is planned for the aim of stimulating professional knowledge, teaching performance and attitudes of them to improve student's learning. Meanwhile, in-house training refers to the use of own employees to distribute formal training to develop skills, knowledge, and potential of their own staffs.¹⁵ In-service or in-house training programs are designed for teachers to overcome the gap between their preparation for instruction and developments in education.¹⁶ So, the teachers' need to keep professionally developing accepting that continuous professional development (CPD) is valuable not only for the enhancement of teachers' performance but also for the ultimate benefit of the students.

Hetzel and Stranske¹⁷ emphasize the improvement of Spiritual Quotient (SQ), Emotional Quotient (EQ), and Intelligence Quotient (IQ) as the success of any kind of learning process including teacher's learning. Here, the emotional intelligence quotient (EQ) is the capability of identifying, using, understanding, and monitoring a person's own and other person's emotions and feelings which can enable the teachers' understanding of the emotion of the student as well.¹⁸ EQ in adults can be developed through training hence, teachers' professional intelligence

also develops through the improvement of emotional intelligence quotient from in-service training programs¹⁹. Meanwhile, according to the “*Spiritual Intelligence Model*”, the spiritual intelligence quotient (SQ) is the ultimate intelligence of human beings with which we assess or solve the problems related to values and meaning, and determine the meaningful course of action accordingly²⁰. According to the study, a higher level of self-consciousness, spontaneity, broader context on teaching, feeling of a deeper meaning of teaching, responsibility, and some other aspects of spiritual intelligence must have been obtained in the personal, or professional life by a teacher either inherently or through training programs²¹. Moreover, Gardner²² finds intelligence quotient (IQ) as the combination of seven independent bits of intelligence like linguistic, logical-mathematical, musical, bodily, spatial and interpersonal intelligence which normally direct a person to solve logical and complex personal, social and professional problems. Gardner’s Theory of Multiple Intelligence offers a theoretical underpinning for identifying and recognizing different capabilities and talents of learners which can assist to develop the sense of self-confidence and performance enhancement of the learners at any teaching learning program. The

positive influence of the IQ factors on the development of teachers’ personal and professional attitudes which can be improved through training is also mentioned by researches²³.

Finally, a number of studies discuss the need for and effectiveness of in-service or in-house training programs for teachers and find it as one of the fundamental aspects of enhancing teachers’ professionalism. Khan and Abdullah²⁴ find regular institutional training and development programs for teachers’ enhancing their above-mentioned performance intelligence. Lack of regular organization based in-service training is responsible for teachers’ poor performance in the class²⁵. So, it can be said that in-house training for teachers leads to improving their personal and professional intelligence quotients which ultimately enhance their performance in the college.

Guidelines for Teachers’ Effective In-house Training : To introduce in-house training in the educational institutions’ number of guidelines can be found in studies. For example, Touhy²⁶ suggested a framework where reviewing the situation, designing a plan, implementing the plan and evaluating the program should be followed to implement the training program. According to Gruber²⁷, assessing training needs, setting objectives of

the training, creating an action plan, implementing initiatives and evaluating, and revising the training are the steps to follow to implement a successful in-service training program. In addition to these, a professional development program for teachers should be guided by the constructivism principles of learning methods. According to the constructivist assumption, learning any elements should be about the earlier knowledge where a person just creates meaning in relation to the previously gained meaning of information and knowledge²⁸.

Methodology

Research Paradigm : This secondary information-based study has followed the qualitative paradigm of research. Aiming at reviewing the selected case study and modeling effective in-house training for the college teachers of Bangladesh, the descriptive explanatory structure has given better insight to this research. Moreover, according to this study, enhancing teachers' performance through in-house training is defined as their Continuous Professional Development (CPD) which can be related to the constructivism type of pedagogical/andragogic aspect.

Research Arena: To review a case study, this research has taken the study by Baral et al.²⁹ that reviewed a three-day training

workshop arranged for the teachers of four medical colleges in Nepal. Moreover, after reviewing many previous literature, this research considered a government college of Bangladesh for modeling an in-house training program for teachers.

Research Setting : Explanation in this study has been made based on teachers' professional intelligence development theories. As it is stated earlier professional intelligence is the combination of a teachers' emotional, spiritual and intelligence quotients as a whole. Hence, for emotional intelligence quotient (EQ) this study presents the view of the "*Theory of Emotional Intelligence*" proposed by Peter Salovey and John Mayer³⁰ in 1990. Again, for presenting spiritual intelligence quotient (SQ) it takes light from the "*Spiritual Intelligence Model*" by Danah Zohar and Ian Marshall³¹ in 2000. Finally, for the theoretical insight of Intelligence quotient (IQ), "*Theory of Multiple Intelligence*" proposed by Howard Gardner²² in 1983 is linked with this study. Furthermore, in this study, the teachers' in-house training model is presented based on the *In-house Training (IHT) model* presented by Lengkenawati et al.¹⁰ in their study in 2015. All the findings, analysis, and discussion of this research are explained as a descriptive explanatory process.

Case Study Review of a Teachers Training Program in Nepal :

Background : This study titled “*An Evaluation of Training of Teachers in Medical Education in Four Medical Schools of Nepal*” by Baral, Paudel, Das, Aryal, Das, Jha and Lamsal²⁹ in 2007 was aimed at the assessment of the effectiveness of three-day training workshop titled “*Teaching-learning Methodology and Evaluation*” arranged in four different medical colleges of Nepal targeting entry and mid-level health professional teachers. One among these four institutions was the venue for this in-house training workshop.

Structure : Key components of the training program were principles of teaching-learning, educational objectives writing, education materials organizing and sequencing, methods of teaching-learning, microteaching, and techniques of assessment. The duration of the training was twelve hours for teaching sessions, seven hours of active group work and five hours of microteaching presentation before the fellow trainees. Pre-training and post-training evaluation through different types of questions was included in this workshop for evaluating participants’ knowledge gain. A semi-structured questionnaire survey was conducted at the end regarding their evaluation and

perception of the importance of this workshop. After analyzing the collected data, the effectiveness of this training workshop was evaluated accordingly.

Professional Development Context of the Training : Though it is not stated directly, professional intelligence which is the combination of emotional, spiritual, and intelligence quotient of the teachers’ are improved through a number of activities performed during this in-house training workshop.

First, this in-house training program had components like organizing and sequencing of educational materials, techniques of assessment, microteaching presentation session with peer evaluation, and demonstration of viva voce. All of these activities can be helpful to improve the emotional intelligence of an educator as organizational awareness, service orientation, inspirational leadership, self-assessment, teamwork and collaboration are considered as the elements of emotional intelligence abilities³². Here, educational materials sequencing and assessment techniques organization can be related to organizational awareness and service orientation. Besides, seven hours of active group work like microteaching presentations with peer evaluation can enhance inspirational leadership, teamwork, and collaboration, and

demonstration and participation at viva voce must help to connect the trainees with the self-assessment aspect of the emotional intelligence quotient.

Second, it had elements like educational objective writing, a session on teaching-learning principles, methods of teaching-learning and opportunity of critical appraisal of on-going activities which can be considered related to improve the teachers' spiritual intelligence quotient. Because, spiritual quotient is defined as the framework of identifying and organizing abilities required for understanding as well as insight into critical question of awareness³³. Here, the above-mentioned training activities are giving a framework to the trainees for organizing and identifying deeper meaning, understanding and perception of teachers' personal and organizational values, awareness, and improvement which are the ultimate components of the spiritual quotient.

Third, this training had pre-test and post-test sessions on answering questions through evaluation tools like short, structured long, objective, practical, clinical and oral questions on the contents of the workshop. These questions answering sessions are surely found to improve the intelligence quotient (IQ) of the educators as it is known that IQ is all

about the ability of assessing and solving logical and strategic problems³⁴.

Evaluation of the Training : It is found from this case study that, the entry and middle-level medical teachers got this training at a suitable time of their service as they can use the acquired knowledge and skills for a long time in their career. From the questionnaire survey on the trainees, it is known that this training was a useful and successful one for the medical teachers to enhance their teaching performance through stimulating and sensitizing the teaching knowledge to be better educators. It included activities that supplement the lecture, had the opportunity of constructing and interacting with own understanding that fulfils the constructivism pedagogy of teaching-learning which is found successful in modern teaching and learning. Moreover, it enriched almost all the aspects of teachers' continuous professional development (CPD) with having the elements of supporting the teachers' emotional, spiritual and intelligence quotients. Meanwhile, the shorter duration of this workshop was one of the matters of concern for the participants of this workshop and they demanded longer duration, more engagement, and more teaching-learning sessions in the module to make it more

effective in-house training for enhancing better performance in the class.

Modeling an In-house Training for College Teachers in Bangladesh

Based on the light of previous case study, to implement in-house training for college teachers, this research proposes the following in-house training model:

This in-house training will follow the footsteps of the *educational training and development cycle* given by Bobb and Earley³⁵ in 2007. It has six stages, which are:

- i) **Identification** of the training requirements;
- ii) **Analysis** of the required training;
- iii) **Planning** of the training;
- iv) **Implementation** of the training program;
- v) **Monitoring** of the training and performance;
- vi) **Evaluation** of the training and its effect.

For the *identification, analysis and planning* stage, this study would like to propose a “Continuous professional development program for improving teachers’ educational practice at college”. This program will be based on emphasizing the development of teacher’s emotional, spiritual and professional intelligence quotients. The total duration of this training program will be six months

where small clusters of ten teachers will be trained during 10 days for each cluster. Trainers for this program will be professors and senior associate professors from their college, who will be trained at the first cluster using external trainers and other experienced resource persons.

At *implementation* stage, this training will implement following four types of modules:

- 1) **Basic knowledge module** which includes various types of teaching methodologies both theoretically and practically.
- 2) **Teaching development module** that includes textbook evaluation, understanding students and their requirements in the classroom, teaching materials preparation, using ICT tools in the classroom and using other teaching materials.
- 3) **Professional activities module** which includes teaching in the classroom, microteaching, peer teaching and observation, and assessment and evaluation of fellow trainees.
- 4) **Critical activities module** including analyzing teaching materials, comparing teaching techniques, solving professional problems through focused group discussion.

All the 4 modules will get 2 days each for presentation, training and workshop based activities where the last 2 days will be for *evaluation* of the training in which, similar to the previous case study²⁹ participants will be evaluated through different short, structured long, objective, practical and oral questions and tasks on the contents of the in-house training.

Finally, in the *monitoring* stage, the effectiveness of this in-house training program on teachers' performance, would be followed by the concerning authority by five levels approach of evaluating the impact of CPD.³⁶ The evaluation levels are:

- I) **Reaction of participants** collected by the structured and semi-structured questioner.
- II) **Learning of participants** known through after training assessment of the trainee.
- III) **Organizational support and change** are known from teachers' change of practice and attitude towards organizational objectives.
- IV **Use of new knowledge and skills** by the participants evaluated from observing teachers' classroom practice and overall teaching skill improvement.

- V) **Learning outcomes of the students** are known from the overall tests and final examination results taken by the college.

Moreover, a post-training questionnaire survey will be conducted among the teachers asking about their improvement of professional beliefs, self-confidence, perception on teaching philosophy through this training course which will ultimately reveal their EQ and SQ improvement by the training. This process of evaluation will be followed and data will be collected for analyzing and further improvement of future in-house training events.

Discussion and Recommendation

Benefits from Teachers' In-house Training : After an extensive literature review and an intensive case study review, this study gets a lot of advantages that a teacher as well as a college can experience from an in-house training program irrespective of the scope or location of the college. Major benefits from arranging in-house training at colleges are:

In-house training offers a better value in terms of money for the teachers than external training because travel cost and other secondary costs can be avoided.

This type of training has the scope of customized training design according to the requirement of the college and especially for the individual teacher or a group of teachers. Since a college can develop and design its training tools and method even can also hire external resource persons according to the training or trainee's demand.

Training within their own service premises gives better adaptability, flexibility, and understanding to the teachers of the particular college. It also connects the trainee teachers to the particular institution or program context.

Organizing an in-house training program in the college expands internal professional communication within the college which would adopt collaboration, cooperation, team building, and improved interpersonal relationship among the teachers.

Because of the involvement of active learning which is connected to the teachers' program objective as well as students' learning, it has a greater opportunity to follow up and observe the improvement of teachers performance through and after the training.

Challenges to Implementing In-house Training in College : This research also finds some potential challenges

to implement in-house training for the teachers at the college level. Those are:

Appropriate designing of the training program such as, choosing an appropriate venue, using the required time duration, selecting suitable training devices, employing accurate resource personnel, and initiating proper course modules for the training can be the challenges of implementing in-house training for college teachers.

Due to lack of motivation, appreciation and enthusiasm for the learning goals, junior teachers might not attend in-house training in their own interest and sometimes they may not take the training seriously since it is conducted by their colleagues and happening at their campus. With the repeated resource persons and contents from internal sources, this type of training program might have limited room for professional improvement. Moreover, due to lack of briefing, the external resource persons may also fail to understand and go with the institutional requirements of the training.

Allocation of sufficient budget for implementing in-house training at college regularly might not be supported by the financial authority which seems to be a great challenge.

Teachers from different subjects at the same in-house training program might not be suitable for improving their pedagogical knowledge, since different subjects need to follow different pedagogy for student's learning in the classroom. This may result in lack of interest of the teachers to attend such types of training programs.

Employing the usual schedule for an in-house training program at the college may hamper the scheduled class time-table and other official works of the colleges and the employees.

Recommendations to Overcome the Challenges: To develop teachers' professional intelligence successfully, an in-house training program of a college should follow some strategies to overcome the above-mentioned challenges. Recommendations to overcome the potential challenges of implementing in-house training at colleges are:

The authority should set specific and measurable aims and objectives of the in-house training which are realistic and achievable as well. The training program should have evaluation, assessment, appreciation, feedback, and follow-up process to increase the interests of the employees and make it successful to enhance teacher's performance.

Careful selection and recruitment of both trainers (internal or external) and trainees are very important for significant in-house training at college. Selecting either subject or position or age or task-based employees for the particular program can be a solution for this.

Goal-oriented and suitable training tools, modules, and methods should be implemented. Exaggeration and repetition of training contents should be avoided for the success of this program.

Budget and other types of endorsement related problems should be fixed with the authority before the training program.

The duration of the training should be suitable according to the professional goals and contents of the training. Required breaks and refreshments should be provided during the training to keep the participants engaged and active.

Elements from knowledge creating constructivism paradigm should be followed to make in-house training successful to enhance teachers' skills, professional knowledge, intelligence quotients, and performance in the classroom.

Conclusion

Based on the previous literature support and reviewing the case study, this research

puts the light on the enhancement of teachers' performance and professional development through the implementation of in-house training at the college level. As a concluding remark, it can be stated that an in-house training program is like an investment for educational institutions to enhance the skills, knowledge, attitude, achievement and professional intelligence of their employees as a whole. Reviewing some studies, it can be said that institutional in-house training surely improves teachers' self-awareness, self-confidence, organizational attitude, professional cooperation and collaboration, logical and problem-solving competence, and personal philosophical insight. All these components can be related to the improvement of teachers' emotional, spiritual, and intelligence quotients which will reflect in their improving performance in the class and finally enhancing student's achievement in learning. So, looking at the everlasting benefits, all the concerning authorities should be supportive to implement an in-house training program at the college level of Bangladesh. Though the common goal of education is the same, the institutional requirements differ from institution to institution. Looking at the professional, situational and institutional needs, a personalized professional development

(PPD) program should be initialized at colleges. A variety of activity-based, diverse teaching approaches, practical-based, reflective, and goal-oriented in-house training programs should be implemented on a priority basis in order to achieve a developed education system through enhancing teachers' performance and students' achievement.

References:

1. Rahman, F., Jumani, N. B., Akhter, Y., Chisthi, S. H. & Ajmal, M., Relationship between Training of Teachers and Effectiveness Teaching, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 4, 2011, p. 150-160
2. Guskey, T. R., *Professional Development and Teacher Change*, *Teachers and Teaching: theory and practice*, 8(3/4), 2002, p. 381-391
3. Osamwonyi, E. F., In-Service Education of Teachers: Overview, Problems and the Way Forward, *Journal of Education and Practice*, Vol.7, No.26, 2016
4. Boudersa, N., *The Importance of Teachers' Training Programs and Professional Development in the Algerian Educational Context: Toward Informed and Effective Teaching Practices*, Vol.1, 2016, <http://exp-pedago.ens-oran.dz>, retrieved from, <https://www.researchgate.net/publication/309430087>

5. Evans, L., What is teacher development? *Oxford Review of Education*, 28(1), 2002, p. 123-137. <https://doi.org/10.1080/03054980120113670>
6. Mohamad, M. and Jais. J., *Emotional Intelligence and Job Performance: A Study Among Malaysian Teachers*, *Procedia Economics and Finance*, 35, 2016, p. 674 – 682
7. Gardner, H., *Frames of Mind: the theory of multiple intelligences*, New York, Basic, 1983
8. Zohar, D., *Re-Wiring the Corporate Brain: Using the New Science to Rethink How We Structure and Lead Organizations*, ISBN 9971-5-1214-9, 1997
9. Darling-Hammond, L. & McLaughlin, M. W., *Policies that Support Professional Development in an Era of Reform*, *Phi Delta Kappan*, 76, 1995, p. 597-604
10. Lengkenawati, N. S., Setyarini, S., Sari, R. D. K. & Moecharam, N. Y., In House Training (IHT) Model to Improve the Abilities of English Teachers in Developing Teaching Materials, *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, Vol. 5 No. 1, 2015, p. 37 – 43
11. Barber, M. Mourshed, M., *How the World's Best Performing School Systems Come Out on Top*, Mckinsey & Company, 2007
12. Al-Zoubi, S., Bani, A. R. M. & Ismail, H., The Effect of in-Service Training Program in Improving Performance Competencies for Learning Disabilities Resource Room Teachers in Jordan, *Educators Digest*, 10, 2010, p. 4-11
13. Richards, J. C., & Farrell, T. S. C., *Professional development for language teachers: Strategies for teacher learning*, Cambridge, UK, Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511667237>, 2005
14. Guskey, T. R., *Evaluating professional development*. Thousand Oaks, CA, Corwin Press, 2000
15. Dawe, S., *Determinants of successful training practices in large Australian firms*, National Centre for Vocational Education Research, Australia, 2003
16. Birman, B. F., Desimone, L., Porter, A. C., & Garet, M. S., *Designing professional development that works*, *Educational Leadership*, 57(8), 2000, p. 28-33
17. Hetzel, J. & Stranske, T., *The IQ, EQ, AQ, and SQ Elements of Effective Pedagogy*, CSE, Volume 10, 2006
18. Goleman, D., *Emotional Intelligence*, New York, NY, Bantam Books, 1995
19. Palomera, R., Fernandez-Berrocal, P. and Brackett, M.A., Emotional intelligence as a basic competency in pre-service teacher training: Some evidence, *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 6(2), 2008, p. 437-454
20. Dolev, N. & Leshem, S., Teachers' emotional intelligence: The impact of training, *The International Journal of Emotional Education*, Special Issue, Volume 8, 2016, p. 75-94

21. Dhatt, H. K. & Tiwari, G. N., Exploring Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence and Self-Efficacy of Student Teachers, *An international peer reviewed research journal*, Vol. 3, No. 1, 2013, p. 95-107
22. Gardner, H., *Frames of mind: the theory of multiple intelligences*, New York, Basic, 1983
23. Akram, M. J., *Factors Affecting the Performance of Teachers at Higher Secondary Level in Punjab*, University Institute of Education and Research, Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan, 2010
24. Khan, S., & Abdullah, N. N., *The impact of staff training and development on teachers' productivity*, *Economics, Management and Sustainability*, 4(1), 2019, p. 37-45
25. Hervie, D. M. & Winful, E. C., Enhancing Teachers' Performance through Training and Development in Ghana Education Service (A Case Study of Ebenezer Senior High School), *Journal of Human Resource Management*, Vol. 6, No. 1, 2018, p. 1-8
26. Tuohy, D., *The Inner World of Teaching: Exploring Assumptions*, London: Falmer Press, 1999
27. Gurber, G., *5 Steps to Creating Effective Training Programs*, 2018, Retrieved on 25/06/2020 from, <http://explorance.com>
28. Kalekar, S., Approaches for Implementing Constructivism in Teacher education- Hurdles and Means, *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*, 2019, p. 48-55
29. Baral, N., Paudel, H. P., Das, B. K. L., Aryal, M., Das, B. P., Jha, N. and Lamsal, M., An evaluation of training of teachers in medical education in four medical schools of Nepal, *Nepal Medical College Journal*, 2007
30. Salovey, P. & Mayer, J. D., *Emotional Intelligence, Integration, Cognition and Personality*, 9(3), 1990, p. 185-211
31. Zohar, D. & Marshall, I., *SQ: Connecting with our spiritual intelligenc*, New York, Bloomsbury, 2000
32. Taylor, C., Farver, C. & Stoller, J. K., Perspective: Can Emotional Intelligence Training Serve as an Alternative Approach to Teaching Professionalism to Residents? *Academic Medicine*, Vol. 86, No. 12, 2011, p. 1551-1554
33. Emmons R., Spirituality and intelligence: Problems and prospects, *International Journal for the Psychology of Religion*, 10(1), 2000, 57-64
34. Zappala, G. & Scott, A., *Intelligence for purpose and meaning: foundations for achieving social impact*, The Centre for Social Impact, Sydney, Issue 17, 2013
35. Bobb, S. & Earley, P., *Leading and managing continuing professional development*, 2nd ed. London: SAGE Publications, 2007
36. Guskey, T. R., *Does it make a difference? Evaluating professional development*, *Educational Leadership*, 59(6), 2002, 45-51



Mental Health Status in Relation to Adjustment during COVID- 19

Dr. Abu Syed Md Azizul Islam

Abstract

The main purpose of the present study was to investigate the relationship of mental health with adjustment of the respondents during Covid-19. The data were collected from 60 adult students selected purposively from different university of Bangladesh, those who stayed home during COVID-19 at Dhaka city. In order to measure mental health, home, health and emotional adjustment two questionnaires were administered on the respondents. The instruments used in this study were personal information questionnaire, Bangla version of General Health Questionnaire (GHQ-12) of Goldberg (1972). Bangla version of Bell Adjustment Inventory (BAI) of Hugh .M. Bell (1934). Data were analyzed by applying pearson product moment correlation and stepwise multiple regression methods. Result indicates that there are significant positive relationships of mental health with home, health and emotional adjustment during Covid-19. Regression analysis indicates that home, health and emotional adjustment are the important predictors of mental health which jointly explains 29.2% variation in mental health. R-square change furthermore indicates that emotional adjustment is the strongest predictor which alone explains 19.4% variation in mental health .However, the findings of the present study suggest that home, health and emotional adjustment have significant impact in mental health of adult students during Covid-19.

Dr. Abu Syed Md Azizul Islam

Professor & Head

Department of Psychology

Dhaka College, Dhaka, Bangladesh

e-mail : syedazizulpsy@gmail.com

Keywords

Mental health, Home, Health & Emotional adjustment, COVID-19

Introduction

Psychology is the scientific study of behaviour and mental processes. To understand the human behaviour systematically or scientifically psychologists have conducted a large number of researches/studies in the different fields of psychology.

Mental health is a state of emotional and psychological well-being in which an individual is able to use his or her cognitive and emotional capabilities, function in society, and meet the ordinary demands of everyday life. Mental health refers to how a person thinks, feels and acts when faced life situation. It is how people look at themselves, their lives and other people in their lives; evaluate the challenges and problems; and explore choices. This includes handling stress, relating to other people and making decisions. It also implies a large degree of adjustment to the social environment. Mental health has the capacity to think rationally and logically, and to cope with the transitions, stresses, traumas, and losses that occur in all lives, in ways that allow emotional stability and growth. In general, mentally healthy individuals value themselves, perceive reality as it is, accept its limitations and possibilities, respond to its challenges, carry out their responsibilities, establish and maintain close relationship, deal

responsibly with others, pursue work that suits their talent and training, and feel a sense of fulfilment that makes the efforts of daily living worthwhile.

A level of psychological well-being or an absence of a mental disorder. Mental health may include an individual's ability to enjoy life and create a balance between life activities and efforts to achieve psychological resilience. Mental health can also be defined as an expression of emotions and as signifying a successful adaptation to a range of demands

The World Health Organization (WHO) Defines Mental Health as a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities can cope with the normal stresses of life can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community.

Most recently the field of global mental health has emerged, which has been defined as the area of study, research and practice that places a priority on improving mental health and achieving equity in mental health for all people worldwide.

Mental Health is a about how one feels inside, balancing one's emotions and having control on them, self-esteem and confidence, being comfortable with whom they are.

Good Mental Health is adequate feeling of security, self-evaluation, spontaneity and emotionality, efficient contact with reality, and self-knowledge, ability to learn from experience.

Characteristics of People with Good Mental health is comfortable feelings about one's self, feeling right about other people and being able to meet the demands of life.

Factors influencing mental health are caused mostly by both biology and environment in adolescents. The biological causes are genetics, chemical imbalances in the body or damage to the central nervous system. The environmental factors are exposure to toxins, violence, disasters stress at chronic poverty.

The term adjustment refers to the extent to which an individual's personality functions effectively in the world of people. It refers to the harmonious relationship between the person and the environment. In other words, it is the relationship that comes among the organisms, the environment and the personality. A well-adjusted personality is well prepared to play the roles which are expected of the status assigned to him with in given environment. His needs will be satisfied in accordance with the social needs.

Adjustment is harmonious relationship with the environment involving the ability to satisfy most of one's needs and most of the one's needs of the demands, both physical and social that are put upon one (Anonymous, 1968).

Adjustment is a state in which the needs of the individual on the one hand and the claims of the environment on the other are fully satisfied (Anonymous, 1972). Psychologists have interpreted adjustment from two important points of view:

Adjustment as an achievement means how effectively an individual could perform his duties in different circumstances. Business, military education and other social activities need efficient and well-adjusted men for the progress and wellbeing of the nation. If we interpret adjustment as achievement then we will have to set the criteria to judge the quality of adjustment.

Adjustment as a process is of major importance for psychologists, teachers and parents. To analyse the process we should study the development of an individual longitudinally from his birth onwards. The child, at the time of his birth is absolutely dependent on others for the satisfaction of his needs, but gradually with age he learns to control his needs. His adjustment largely depends on his interaction with the external environment in which he lives.

He comes to learn to articulate the details of his environment through the process of sensation, perception, and conception.

Home adjustment contains thirty five questions. High scores on home adjustment tend to be associated with one or more of these conditions in the family: Inability to live up the expectations of one or both parents; Role reversals of parents; Feelings of parental rejection, Persistent tensions in the home, Arbitrary restrictions and non-affectionate discipline, Sibling rivalries and fear of parents.

On the contrary, low scores mean that the individual is getting along well at home and that this phase of his adjustment is satisfactory to him. However, occasionally a low score indicates that the individual is too dependent upon his home to get parental love and protection rather than to seek to merit the acceptance and affection of his peers outside the home.

Health adjustment, eleven health problems are covered in this section of the inventory such as frequent colds, Nose and throat discharge, diseases, operations, or accidents with residual effects, fatigue, sleeplessness, weight problems, headaches and pains, skin diseases. High scores indicate unsatisfactory health adjustment whereas low scores indicate satisfactory health adjustment.

Emotionality adjustment is unstable when individuals are with high score tend to be emotionally, with low score to be emotionally secure. High scores on emotionality adjustment suggest that the respondents have concerns in one or more of the areas such as a tendency to live in a world of daydreams and to imagine things, volatile feelings such as fear, anger and excitement, feelings of guilt, worry, anxiety and nervousness.

Bangladesh is the second most affected country in South Asia after India. The COVID-19 pandemic in Bangladesh is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019. COVID-19 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The virus was confirmed to have spread to Bangladesh in March 2020. The first three known cases were reported on 8 March, 2020. COVID-19 is the disease caused by a new coronavirus called SARS-CoV-2. WHO first learned of this new virus on 31, December 2019, following a report of a cluster of cases of 'Viral Pneumonia' in Wuhan, People Republic of China.

Review of the Related Literature

To determine mental health and adjustment of an individual age and gender are the major factors. It is one of the biological causes which influence mental health and adjustment of an individual. Sharma (1979) focused on self-concept level of

aspiration and mental health as factors of academic achievement. A sample of 1060 students selected randomly from xi and xii grades of schools and Uttar Pradesh was studied. Piers-Harris children's self-concept scale, Ansari and Ansari's LA; coding test. As Thana's Adjustment inventory to measure the mental health.

The position of a child in the family exerts influence on the individual roles to be played. This affects the adjustment of the individual.

Vasuki and charumathy (2004) compared the sibling rivalry with achievement motivation frustration, mental health and self-conflict of adolescents on a sample of 60 girls and 60 boys of age 15-18 years. Mental health was assessed by mental inventory developed by Jagadish and Srivastava (1983). Rivalry resulted in inferior level of achievement motivation and poor mental health. Greater extent of sibling rivalry also leads the adolescents to become more frustrated. Rahi et al. (2005) found that the prevalence of psychophysical disorders was significantly higher in the first burns and also reported more number of psychopathological.

In Indian society, caste and religion influence the individual a lot because of the prevailing prejudices as some upper caste and some as lower caste.

Parents and other elder's acts as the role models to their children, their characteristics and adjustment affect the personality of the child. Maternal education is significantly associated with psychopathological disorders in children and also prevalence being highest in offspring of illiterate mothers (Rahi et al; 2005)

The COVID-19 pandemic in Bangladesh and India is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by several acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). World Health Organization has declared it a "Public Health Emergency of International Concern" on 30th January, 2020. There is more than 3.65 lakh confirmed cases worldwide by October, 2020 (World Health Organization, 2020). The virus was confirmed to have spread to Bangladesh and India in March 2020. Since then, the pandemic has spread day by day over the both nations and the number of affected people has been increasing.

In order to stop nationwide spread, the government declared lockdown throughout both nations and the respective Government prepared some necessary steps to spread awareness to keep this syndrome away from them. The sudden lockdown restricted mobility, social

distancing was imposed, all the shops, malls and local markets were shut down. People had to stay at home and restrict their social life. The sudden drastic change has caused a severe change in our lifestyle including shopping groceries and pharmacies, train stations, workplaces, and residential (Saha, Barman & Chouhan, 2020).

Rationale of the Study

Our mind are not separate entities from the rest of us. When we are distressed, our physical health is also affected, our spirits flag. Many physical conditions are actually rooted in a state of mind. Our personal relationships and adjustment are affected by both physical and mental issues. Lives can even be endangered when people are stressed, depressed and anxious, or grief-stricken. So, mental health issue is very important in our life. Marx and Wooly (1998) said that mental health problem can negatively affect within families, schools, and communities and result in financial and social problems. Scientific study of mental health and adjustment are important because they can provide positive contribution to the quality of life. Mental health services in our country are inadequate. Well-trained practitioners are scarce; drugs and psychological interventions are unavailable or of poor quality. People become conscious when

it terms in severe case. So it is necessary to know how some factors with mental health and adjustment status. Thus, present study is undertaken for studding relation of mental health with home, health, & emotional adjustment during COVID- 19.

Objectives of the Study

The main and specific objectives of the present study were to investigate–

- i) Whether there are any relationship between mental health and home, health and emotional adjustment.
- ii) Whether there is any relationship among the variables of the present study during COVID- 19.

Method

Sample and Sampling Technique

A cross-sectional survey design was followed for conducting the present study. A total number 60 students. They were selected purposively from the different University of Bangladesh those who were stay home during COVID-19 at Dhaka City. In selecting participation, age, sex and educational qualification income of the parents were considered. Among 60 participants 34 were male (56.66%) and 26 were female (43.33%). The age range of participants was 18 to 25 years.

Measuring Instruments

Demographic and Personal Characteristics Questionnaire

By this questionnaire, the data on age, sex and education level and monthly income of the parents were collected.

The General Health Questionnaire (GHQ-12)

This scale was originally developed by Goldberg (1972) in 1981 to measure mental health of respondents. This 12 item scale contains 6 positive and 6 negative items. Responses were given weights of 0, 1, 2 and 3. The items were answered on to four-point response format (“not at all”, “somewhat” “to a considerable extent” and “to a great extent”). Positive items were scored in 4 points, from 3 to 0 and the negative in the reverse order from 0 to 3. Total scores are the sum of all the items, with a range of 0 to 36. High score in the scale indicates the high mental health problems. The reliability of the Bangla version of the GHQ-12 (Sarker and Rahman 1989) was measured by parallel form method which was found to be quite satisfactory ($r = 0.69$)

Original & Bangla Version of Bell Adjustment Scale

The questionnaire of the Bell Adjustment Inventory was first published in 1934 by Hugh. M. Bell. The last revision

of the Bell Adjustment Inventory was published in 1962. The 1962 revision of the Bell adjustment inventory provides six measures of personal and social adjustment. These areas are: Home, health submissiveness, emotionality hostile, and masculinity-femininity. The Bell Adjustment Inventory (1962) was first translated in Bangla by Faruk. T (1980). This Bangla version of Bell Adjustment Inventory was checked by several distinguished persons in education and administration of Rajshahi and Dhaka University, to find out the correlation co-efficient the Bengali version of the Bell Adjustment Inventory and the original Bell Adjustment Inventory were administered on twenty students (10 male and 10 female) with an interval of six weeks. The results show that both versions are highly correlated. To verify the reliability of the Bangla Version of Bell Adjustment Inventory, a test retest method was followed at an interval of three months. Correlation co-efficient of the Bangla Version with the English original version and the test-retest scores were all significant at 0.05 levels.

Procedure

Data of the present study were collected individually. Necessary rapport was established before administering the questionnaires. For administering

instruments each participant was given the following general instruction, “this questionnaire asks about your personal characteristics, home health and emotional adjustment. Your answer will be completely anonymous and confidential and will be used only for research purpose. Try to answer all questions as honestly as possible. Give each question a moment thought and then answer it”. Besides this general instruction each participant was given separated instruction for each of the measure and scale. They were allowed to ask question finally if they had regarding any item of the scale.

Results

In order to analyze the data Mean, Standard Deviation, Co-relation and stepwise multiple regression analysis were applied on the obtained score. The obtained results are presented in table 1 through 5.

Table- 1

Mean and Standard Deviation of Mental Health and Adjustment

Variable	Mean	SD
Mental health	12.48	5.92
Home	6.68	3.18
Health	7.41	3.42
Emotional	10.02	4.51

Table-1 Present Mean and SD of Dependent and Independent Variable. The Mean 12.48, 6.68, 7.41, 10.02 and Standard deviation are 5.92, 3.18, 3.42, 4.51 respectively.

Table: 2

Correlation matrix among of study variables Home, Health, Emotional and Mental Health.

Variable	1	2	3	4
Home	-	-	-	-
Health	.248	-	-	-
Emotional	.401	.346	-	-
Mental health	.402	.368	.406	-

The correlation matrix of sample correlation of each independent variable with dependent variable are presented. The Result indicated that emotional adjustment had the strongest correlation ($r = 0.406$, $p < 0.01$) in case of dependent variables, home adjustment is the second largest ($r = 0.402$, $p < .01$) in case of dependent variable health adjustment ($r = .368$, $p < .01$) the lowest correlation with dependent variables. Results of table-2 further indicated that there were inter-correlation among independent variables.

Table: 3

Stepwise Multiple Regression co-efficient of Home, Health and Emotional adjustment on Mental health.

Independent Variable	Standardized Bata (β)	t	Significance
Constant	-	2.11	.01
Home	.291	.06	.05
Health	.302	1.26	.01
Emotional	.268	1.68	.05

Table- 3, Show the partial standardized betas (β s) indicated that three type of adjustment in the model were predictor of mental health.

Table: 4

Selected Statistics from Regression of mental health on home, health and emotional adjustment:

Independent Variable	R	R ²	R ² Chang	F Chang	Sig F
Emotional	.46	.211	.194	8.46	.01
Health	.51	.260	.089	6.86	.01
Home	.54	.292	.064	4.24	.05

Dependent Variable: Mental health

Result of regression analysis indicated that strongest predictor of mental health is emotional adjustment, which alone explained 19.4% of variance. The result of the analysis further indicates that health adjustment was the second important predictor of mental health. The result of the analysis further indicates that home adjustment is the third important predictor of mental health. R² change indicated that only emotional adjustment explained 19.4% variation in mental health. R² indicated that these three predictors could be accounted for 29.2% of variance in mental health.

Table 5

The overall F-Test for regression of mental health on emotional, health and home adjustment.

SV	SS	df	MS	F	Significance
Regression	669.06	3	223.02	9.11	.001
Residual	1369.76	56	24.46		
Total	2038.82	59.	-		

The significant F-test, $df = (3, 56) = 9.11$, $P < .001$ of table 5 indicate that variation in the mental health was accounted for by joint linear influences of emotional, health and home adjustment.

Discussion:

The present study was designed to investigate the relationship of mental health with adjustment during COVID-19. In order to measure the respondents' mental health and home, health and emotional adjustment two sets of questionnaires were applied on student selected purposively from different University of Bangladesh those who are stay home during COVID-19 pandemic situation at Dhaka City. The obtained data were analysed by applying Pearson product moment correlation and stepwise multiple regression. Results of inventory correlation coefficients among the dependent and independent variables. To consider the effect of independent

variables on respondent's mental health, regression analysis is also carried out.

The first objective states that mental health is related with home, health and emotional adjustment. Results indicated that there is a significant positive relationship of mental health with home, health, and emotional adjustment. Many researchers have found that the quality of home environment is a significant factors to measure mental health. Also the study revealed that over protection of parents facilitated can influence our health, home and emotional adjustment and overall our mental health. Life is not easy and worth living. There are many factors which influences mental health. Result show Table-2 that mental health scores are positively correlated with emotional ($r=0.406$, $p<0.01$), home ($r=0.402$, $p<0.01$), health ($r=0.368$, $p<0.01$). That means people (high score in the GHQ-12) who have good mental health have well their home, health and emotional adjustment.

In this study Table-2 states that every variables both dependent and independent variables is correlated with each other. Standardized Beta (β) Table- 3 also indicates that mental health is positively related with home, health, and emotional adjustment. Results of regression analysis Table-4 indicated that the strongest

predictor was emotional adjustment which alone explained 19.4% variance in mental health. The results of the analysis further indicated that health adjustment was the second important predictor of mental health. The results of the analysis also further indicated that home adjustment was the third important predictor of mental health. R-square change indicated that only emotional adjustment explained 19.4% variation in mental health. R-square indicated that these three predictors could be accounted for 29.2% variance in mental health.

These results are consistent with many researchers research findings (Sharma 1979, Meninger 1945, Vasuki and Chasumathy 2004).

Conclusion

Overall findings of regression analysis it can be said that home, health and adjustment are the significant predictors of mental health. Bell (1962) mentioned that high scores on home adjustment feel parental rejection, tensions in the home, unable to identity with of relate to one or both parents, feel fear of parents. On the other hand low scores feel well at home, can adjust with the parents etc. High scorers in health adjustment feel nose and throat discharge, visual difficulties, fatigue, weight problem etc. that have significant role on their mental health (Bell, 1962).

According to Bell (1962) high scores on emotionality adjustment suggest that the respondents have concerns in one or more. A tendency to live in a world of daydreams and to imagining things, volatile feeling, worry, anxiety and nervousness, inferiority, isolation and feeling of guilt.

In fine we may conclude that those who are able to adjust perfectly in case of adjustment they bear a good mental health also during COVID- 19.

References

- Anonymous, 1968, *Dictionary of Behavioural Sciences*, Macmillan, New York
- Anonymous, 1972, *Encyclopaedia of social science*, Mac Millan and the Free Press Pvt. Ltd.
- Bell, H.M. 1962, *Bell Adjustment Inventory Manual*, California, Consulting Psychologist Press Inc
- Dhoundiyal, 1984, *Home environment and emotional disturbance among adolescents*, Ind. J Psych; 59 (2): 17-22
- Dwairy, Marwan, 2004, *Parenting styles and mental health of Arab gifted adolescents*, Gifted child quarterly, 48 (4); 275-286
- Goldberg, D. P. (1972). *The Detection of Psychiatric Illness by Questionnaire*, Oxford University Press, London
- Jagadish, S. and Srivastava, A. K, 1983, *Manual for mental health inventory*, published by monovaigyanik Parik Shan Sans than, Varanasi
- Rahi, Manju, Kumauat, A.P, Garg, Suneela and Singh, M.M, 2005, *Socio-demographic Correlates of Psychiatric Disorders*, Ind—J. Ped; 72 (5): 395-398
- Rao, V. N. and Parthasarathy, R., 1993, *Mental Health Risks among the Socially Disadvantage High School Students: Initial Observations*, Ind. Psy. Rev; 40(5-6); 36-39
- Saha, J., Barman, B., & Chouhan, P. (2020), Lockdown for COVID-19 and its impact on community mobility in India: An analysis of the COVID-19 Community Mobility Reports, 2020. *Children and Youth Services Review*, 116
- Sharma, D. and Nanda, P; 1997, *Effect of Parent Child Relationship, Socio-economic Status and Ordinal Position on Aggressive Behaviour of Rural and Urban Adolescent Boys*, Ind, Psych, Rev; 49: 12-18
- Sharma, R.R; 1979, *Self-concept, Level of Aspiration and Mental Health Astactors in Academic Achievement*, Ph. D Dissertation, B.H.U
- SPSS (Statistical Package for Social Science), 26 Version, IBM in May, 2021.
- Srivastava, S.K; Prasad, Deepsh chand and Kumar Vipin, 1999, *A Study of Mental Health of Hindi and English Medium Students*, J. Edu. Res. Extn, 36(3): 23-28
- Vasicki, K. and Charumathy, P. J., 2004, *Sibling Rivalry and Its Relation to Achievement Motivation Frustration Mental Health and Self- conflict of Adolescents*, Ind. Psy. Rev; 62 (2); 72-78
- World Health Organization (WHO), 2020, *Consideration of Adjusting Public Health and Social Measures in the Contest of COVID-19*



Socio-political Mobilisation of Madrassas and Muslims in Colonial Surma-Barak Valley

Dr. Mahbubur Rahman Laskar

Abstract

Madrassa in colonial India played an important role in Muslim society. In the pre-colonial period under Sultanate and Mughal rule madrassas and ulemas were patronised by the royal court and ulemas had special significance in the strategy of the ruling dynasties of India. When Britishers became the master in the politics of the country, the ulemas lost their patronage as well as facilities which they were enjoyed so far. Thus they were furious and the revolt of 1857 gave them an opportunity to ignite against the British. The Britishers ruthlessly suppressed the revolt and huge numbers of Ulemas were hanged. Years followed the revolt of 1857 raised the question of the Islamic identity of the Muslims of India under the British regime. Many Ulamas left India for survival and a portion remained for the safeguard of Islamic identity and education Dar-ul-Ulum Deoband Madrassa was established in 1866. It brought a new era and product of the madrassa established several such madrassas throughout the country within a short period with the same vision and mission and ideologies. These were not just educational institutions but missionaries of the ideologies of Dar-ul-Ulum deoband which in subsequent days rooted in different parts of the country. The present work is an attempt of writing how the madrassas and ulemas played an important role in socio-political mobilization in the then Eastern Bengal specially Surma-Barak Valley till the decolonization of the country.

Dr. Mahbubur Rahman Laskar

Assistant Professor

Department of History

PDU Govt. Model College

Katlicherra, Hailakandi, Assam, India.

e-mail : mahbuburbachchu@gmail.com

Keywords

Madrassa, Ulema, Muslim, Mobilization, Surma-Barak Valley

Introduction

Madrassa played a pivotal role in the Muslim society of India during the medieval and modern periods. During the medieval period, the madrassas and ulemas received royal patronage and ulemas had a profound influence over the ruling dynasties of India. When Britishers acquired the supreme political power of India, the ulemas lost their patronage and privileges and were strongly against the British, and their reaction was reflected in the Revolt of 1857. Ulemas were killed and hanged on a large scale. Following the revolt of 1857 Muslims of India got threatened about their religion and Islamic identity under the British regime and to save the Muslim and Islamic identity Dar-ul-Ulum Deoband Madrassa was established in 1866. Dar-ul-Ulum Deoband ushered a new era in the Muslim society of India and a new trend of a movement started against the British in a parallel way along with Islamic religious education. Madrassa passed *Alims* (in plural *ulema*) who after completion of studies acted as *Imam* or *Pesh-Imam*, in different mosques and *Muhtamim*, Maulanas, in different madrassas had a profound influence in Muslim in mobilizing Muslim society. This paper is an attempt to focus on the role of such

ulemas and madrassas of Surma Barak Valley in socio-political mobilization.

Objectives

The objective of the present paper is to focus on the socio-political role of the madrassas in mobilizing the Muslim masses in general and to the Muslims of Surma-Barak Valley in particular. An attempt is also made to focus on the ways the madrassas responded to the communal mobilization in pre-partition days i.e. whether they contributed to communal tensions or contributed in defusing the same. It also tried to focus on the ideological disputes amongst the Muslims under different Schools of thought and how the Muslims of Surma-Barak Valley responded to it.

Source and Methodology

The present study is based on both primary and secondary sources. The primary sources are verses of the Quran, the Hadith, souvenirs, pamphlets, *fatwas*, etc. whereas secondary sources published books, research works of other scholars. Oral sources were also gathered through the interview method and which was supplemented in the sources. So far methodology is a concern while preparing the paper empirical methodology is adopted and followed.

The Arabic word ‘*madrassa*’ generally has two meanings: in its more common literal and colloquial usage, it simply means, ‘school’, and in its secondary meaning, a *madrassa* is an educational institution offering instruction in Islamic subjects, the Quran, the *hadith*, and *fiqh*. *Madrassa* means a place where *dars* (lesson) is given to students. In this paper, the term *madrassa* refers to Islamic religious school. *Madrassas* of Bengal and Assam during the Colonial period are mainly of two types. Government aided *madrassa* and Public *madrassa* which is called Quomi *Madrassa*¹ (funded and run by the public through voluntary contribution).

Madrassas are the base of Indian Muslim society as well as a main source of education for a large number of children in the country. They function within the norms and practices of a society, play certain social roles and interact with political institutions. Societal norms and practices along with the various political forces influence the orientation and functioning of these institutions.² In the context of India mosque and *madrassa* have been of great importance not only during Muslim rule but also during the British period as well as in secular and independent India. In every stage and every field of life, *madrassa* played a vital role. *Madrassas* had been the centers that

enjoyed heavy influence on every class of society.

In medieval India, *ulemas* enjoyed the high privilege, position and patronage in the royal court, and thus had great influence over politics. Socially too their high position had the religious sanctions and thus they could play a significant role in mobilizing the common Muslim masses. In the 19th century under the banner of *Wahabi* Movement and socio-religious reforms, *madrassas* and *ulemas* played a vital role to free the country from the British dominion.³

Madrassa incited Indian Muslims to maintain their identity and entity as Muslims. It helped the Muslims not only to preserve their Islamic identity but also influenced the Indian culture and made a good synthesis in the form of Indo-Islamic culture. After colonial occupation Muslims feared the loss of their Islamic culture, thinking that it would either fall prey to the western culture or merge in the majority. It was the *madrassa* that emerged as a refuge to protect Islam and Muslim cultures. Manzoor Ahmed in his *Islamic Education: Redefinition of Aims and Methodology*, stated, “*The deeni madaris in India in the last 200 years have played a vital role, which has no parallel history... history bears witness to*

the creditable manner in which the ulema not only checked the inroads being made by the British masters and the Christian missionaries in the cultural life of the Muslims but also prepared a generation of freedom fighters.”⁴

The foundation of Dar-ul-Ulum Deoband (1866) brought a new era of Muslim mobilization. With the foundation of Deoband Madrassa, *madrassa* becomes an important agency of Muslim mobilization. The institution played the dual role of disseminating Islamic knowledge and mobilizing the Indian Muslims to participate in the freedom to expel the British.⁵ The *Madrassa* not only imparted religious education but also imparted lessons on nationalism and patriotism and remain anti-colonial till the very last day of Colonial rule. The Deoband movement and the Deoband Madrassa propagated their messages through-out the country and that mobilizes the Muslim masses in general and Ulemas in particular and it is for this Deobandi *Madrassas* were established through out the country in the late 19th and 20th centuries.

From 1866 to 1947, the Deobandi ulemas had never compromised with the British Government and always held aloft the torch of freedom. Deobandi ulemas opposed the Aligarh Movement of Sir

Sayed Ahmed Khan due to his leaning towards the British and the ulemas were with Congress in strong bond and highlighting their contribution Yoginder Sikand wrote, “*Historically madrassas have contributed to the national cause. Graduates from the madrassas as well as the founders of some of the leading Muslim seminaries in India played an important role in the struggle against the British, a fact that is conveniently ignored in India’s school history textbooks.*”⁶

An interesting part of the history of India’s freedom movement was that the *madrassa* people who were considered poorly educated and less intelligent by one section of the intelligentsia were thought to be always opposing every disastrous policy of the British government, while those who were considered to be intelligent and well educated were thought to be loyal to the colonial government. In this regard, Manzoor Ahmed stated, “*That a large number of patriots and leaders who fought for India’s independence came from these religious seminaries, while the modern universities produced many collaborators and officials to run the alien government.*”⁷

The ulemas of the *madrassas* have always had great importance in the Muslim community. According to the Holy

Quran⁸, the one who possessed knowledge came third in the scale of reverence after God and his angels. Hence, they are regarded as the heir, the last heirs of Prophet Mohammad, and are entrusted with the responsibility of guiding the people spiritually and ethically right from the cradle to the graveyard.⁹ The necessity of good *ulemas* as well as madrassas and their role in the socio-political life of the Muslim has always remained undeniable.

The Muslim society of Bengal in general and Surma-Barak Valley, in particular were developed centering around mosques. Every Muslim family in one way or the other way was intimately connected with the mosque. Here mosques plays multiple roles combining within the role of community space, a place for prayer, religious instruction, and political discussion.¹⁰ Every Muslim family is looked upon as a member family of a particular mosque which in this region is called *Hamsaya* (particular unit). The *Imam* of the mosque enjoys an exalted position in his *Hamsaya* like that of a king. He is in fact, the king of the particular unit. He is the sole administrator, the judge in socio-cultural and religious affairs of that particular unit. All member families are ethically bound and expected to obey him and his decision. Madrassa passed out students often get employed

in the rural areas as the teacher in maqtab and small madrassas or as *Imam* and *Pesh-Imam* in small towns and villages and thus they not only have a firm grip on young minds but also influence their guardians. Considering the rural situation of the Muslims of Eastern India Binayak Dutto quoted, "*As the village, they acted as Imam of mosques presided over by Jumma and Eid prayers and officiated at most other religious functions and rites commonly observed by the rural maqtab generally in addition to their priestly function ...learned or not the influence of mullah over the rural society was vital and in a sense absolute.*"¹¹

Every Muslim has three significant events in his life viz. Birth, Marriage, and Death. In each of these events, the presence of a madrassa-educated *alim* is needed. After the birth of a newborn baby, the sound of 'Azan' (Call for prayer) and 'Iqamat' (second call to prayer given immediately before the beginning of prayer) has to be recited on his right and left ears respectively and for that, a person having basic Islamic knowledge is required. The guardians of the baby prefer an *alim* for the same.¹² Afterwards, on the occasion of the naming ceremony of the baby, the relatives and the guardians again depend upon the 'Imam' of a mosque or a madrassa qualified *alim* to give a good and

meaningful name to the baby. Therefore, in spite of Bengali as the mother tongue, the name of the people of this region are mostly in Arabic and Urdu.

Marriage is an important event of life that integrates two souls and promises a conjugal life, sharing many happy and sorrowful moments. Again, it is a madrasa educated *alim* mostly the *Imam* of local mosque conducts the event of marriage through *Khutba* and *dua* (prayer) prays for the welfare of the conjugal life of both the bridegroom and the bride. 'Death' is the final event of human life. All the hope, wish desires, ambitions, expectations that start after birth terminate with death. In Muslim society, the only event left after death is to bury the body after '*Janaja*', the final prayer, for which the '*Imam*' of the mosque or a madrasa-educated *alim* is needed. A serious patient who in his death bed calls an *alim* for *Tawba* (regret for the mistakes/sins done in life knowingly or unknowingly and a promise for rectification. Even after death, the near relatives of the dead, depend upon a madrasa educated *alim* for the final prayer on the dead body '*Ziarat*'.¹³

The main structure or the pillar of Islam is *Namaz*, which is *farz* (mandatory) for all Muslims (not for the children and abnormal). And for proper learning of

namaz, he/she needs an *alim*. Certain basic learning is mandatory for every Muslim and he required one *alim*. There is at least one *alim* in every mosque who conducts the way as provided in *Shariya*. In the Quran and Hadith also the ulemas have been accorded high prestige, so people also pay their high regards to the ulemas. Prophet Mohammad had himself declared that ulemas are his heir. Common people honour every word of the ulema without even minimum consideration or rational thinking. Common people believed that since the ulema has learned Quraan and Hadith and also knows *Islamic Shariya*, so his way of living is as per the *Shariya*. The Quran also assured high rewards to those who pay their respect to the *ulema*.

Madrasa educated people enjoy especial position prestige in Muslim society. By the end of the 19th century, the Muslim society was structured in such a manner that the role of the *ulema* was rendered indispensable, and paying respect to him was synonymous with honouring Prophet Mohammed. The *Imam* of the mosque, *taleba* (learner) of the madrasa, teachers of madrasa, and person studied in madrasa are considered as preachers of *Islam*. The way of life, dress code, behaviour dialogue, etc. are followed by the common rural Muslims of the society. The common man hopes to find spiritual

elevation by remaining in touch with good ulemas, especially the *Pirs*. Ulemas of madrassa receive honour and regard from the Muslims wherever they pay their visit. A common man, on his way, wishes to *salam* whenever he sees an *alim*, even if the later is not known to him. His interaction with an *alim* is always very polite. He considers that if an *alim* is pleased with his behavior then Prophet Mohammad will also be pleased to him as the Prophet has himself declared ulemas to be his heirs. Thus, even if a common Muslim finds an *alim*, *ulema*, or *taleba* who is not known to him, he considers it is his religious duty to pay respect by wishing him with *salam*. This exchange of *salam* brings both the persons closer emotionally.¹⁴

In the society of rural Eastern Bengal and Assam, the ulemas played a pivotal role. The ulemas were a part of the common Muslim society, yet they were given special status because of their acquired knowledge in Islamic theology. The madrassas of Surma-Barak Valley were mainly the product of the Deoband movement and hence were affected by its socio-political ideologies. Although Barelwi or *Ahl-i-Sunnat-Wa Jamaat* ideologies were later propagated to some extent but were mainly confined among the ulemas who studied in United

Province and had little impact in Colonial Surma Barak Valley. It was mainly by the 1940s that some madrassas which were started as Deobandi madrassa came under the grips of the Barelwi ulemas.

The mosque was a spiritual and mental refuge for the people of Surma-Barak Valley. Whenever a Muslim faced any serious problems he used to go to a mosque, madrassa, or to the residence of an *alim* provide some money in the form of *Hadiya* and request him to pray for his recovery from the current situation. They also used to go to an *alim* after the success of any of the family members on social and economic matters so as express their gratefulness to God. For this, they required the mediation of a learned scholar in Islamic theology, whom they consider to be closer to God. They also used to visit an *alim* to request him to pray to God for the success of a family member in social or professional life. Commonly the Muslims used to visit them with the expectation that God would seriously listen to the prayers of ulemas as God likes them most, and thus their recommendations would definitely bear fruit. The Muslim families also used to invite one or more *alims* in their residence with particular objectives and used to render his best services to them, considering that if they (ulemas) were pleased with his services

and hospitalities then his objectives or ambitions would be fulfilled. In addition to service, hospitality and food, the host also used to pay them in cash as *Hadiya* as per his capacities and wishes. However, in Surma-Barak Valley, the system has had its flexibilities in actual practicing.

People both poor and rich and both from rural and urban backgrounds used to find pleasure in passing their valuable time with the ulemas of madrassas. Through their interactions with the *alims*, they hoped to the value of Islam. Thus, in multifarious ways, the ulemas of mosques and madrassas played a significant role in different aspects of the life of the rural Bengali Muslims. They controlled and regulated the Islamic way of life from the cradle to the graveyard and became a friend, philosopher, and guide to a person during his joys, festivals, and sorrows.¹⁵

The political mobilization among the Muslims during these days was mainly because of the activities of the All India Muslim League and Jamiat Ulema-e-Hind, which can be considered as the matured form or organization of Dar-ul-Ulum, Deobond. Jamiat Ulema-e-Hind which was organized as a Socio-Religious and Cultural Organisation in 1919-20, mainly by Deobondi Ulemas for the sake of the interest of the Muslims of India, but in the

freedom movement of India, its role was not less than the role of a major nationalist political party. However, when Hussain Ahmed Madani, became the President of Jamiat Ulema-e-Hind, the organization also assumed the nature of the political organization and even took part in the election. Jamiat Ulema Hind was mainly an organization of the Ulemas of India, but as Ulemas are the models of the society, so, the ideas of the organization soon spread out to the common Muslim masses of India. Its branches were soon started at the Provincial and District level. General educated and common people also became its members, and people of the areas where the Deobondi system of education and ideas established become its supporters.

The political activities of the Muslims of Surma-Barak Valley were directly connected with North Indian Muslim politics. Muslim politics or political mobilization of the Muslims of Surma-Barak Valley was integrated with the Pan-Indian Muslim political mobilization. At the provincial level, the Ulemas and the Muslims of Surma-Barak Valley shared the political activities with the Muslims of Surma Valley and Muslim leaders of Surma Valley had a profound influence over Assam politics. In July 1921, in the All India Khilafat Conference at

Karachi Maulana Hussain Ahmed Madani declared, *“Joining in the British army, encouraging others to join or any type of co-operation is religiously prohibited; it is the duty (Farz) of every Muslim to send this message to the Muslim soldiers of British army in India.”*¹⁶ Maulana Madani also said that the love of Motherland is part of ‘Iman’¹⁷ (faith, belief).

On 15th February 1922, a meeting of the Ulemas was arranged at Kanaighat, Sylhet with due permission from the police. Several thousand masses assembled in the gathering. Commissioner Webster arrived there on a horse along with a Gurkha Regiment. Commissioner Webster ordered the crowd to disperse and while the crowd started dispersing Commissioner issued a firing order within a few minutes. Constable Banka Behari, who was in front of the Commissioner declined to fire on unarmed peaceful crowd, was immediately shot dead by the Commissioner. Gurka soldiers killed five other people and 36 were wounded.¹⁸

Gandhiji started Civil Disobedience Movement in 1930, people of Surma Barak Valley also actively participated in the movement. Several of Muslim personalities met police atrocities in the Civil Disobedience Movement in Silchar, Hailakandi and Karimganj. Prominent

among them are Pir Mohammad Ali, Maulavi Gulam Sabbir Khan, Sajid Raja Mazumder, Khurshed Ali Mazumder of Silchar, Abdul Matlib Mazumder, Faizur Rahman Laskar, Harmuj Ali Barbhuiya, Maulavi Abdul Latif Laskar, (Gada Maulavi) of Hailakandi, Makaddas Ali Tapadar, Maulana Jalal Uddin Choudhury Mahmud Ali Hazi Matasin Ali Choudhury of Karimganj and others.

In Barak valley, although Dar-ul-Ulum, Banskandi was established by the end of the 19th century, its direct role in the political mobilization of Barak Valley in the early 20th century is not worth-mentioning. During the time of the Khilafat Non-Co-Operation movement, Ulemas and the ‘*talebas*’ of this Madrassa for the first time participated in the political movement. Maulana Nur Ali of Dar-ul-Ulum, Banskandi, Maulana Wazid Ali, Maulana Hamid Raja, Maulana Alim Uddin of Dar-ul-Ulum, Banskandi took an active part in the movement.¹⁹

However, ‘Madinatul Ulum’, Baghbari, Karimganj played a tremendous role in the freedom movement of India. During Khilafat Non-Co-Operation Movement, the Ulema of this Madrassa avoided even the government market and started ‘Khilafatganj’ near Kaliganj Bazar (Karimganj).²⁰ Ulemas and the ‘*talebas*’

of this Madrassa also participated in the Civil Disobedience and Quit India Movement along with other nationalists of this Valley.

With the passing of the historic Quit India Resolution on 8th August 1942 by the Indian National Congress, the Surma-Barak Valley entered into the last war on the path of its independence against the Colonial Government. On 18th August 1942, All India Jamiat Ulama Hind adopted a resolution to support Quit India Movement led by Congress. So, the Congress and Jamiat volunteers in Surma-Barak Valley went to organize protest meetings, processions, *hartals*, picketing at schools and Colleges, shops, selling foreign goods. A meeting was held at Gangajal Madrassa of Surma Valley under the Presidency of Matasin Ali Choudhuri, where the resolution was taken to form, “*Revolutionary Sainik*”. The Madrassa secretly made a *Sainik* Camp to carry on the movement. On the other-hand as per the decision of All India Jamiat Ulama Hind in 1944, “*Ansar Bahini*” was set up in Surma Valley. The Jamiat leader of Surma-Barak Valley toured most of the Madrassas and Schools of the Valley and admitted twelve thousand members of having strong faith and conviction in “*Ansar Bahini*”.²¹

Response of Surma-Barak Valley were mixed during Quit India Movement. Cachar was to some extent passive due to the fear psychology of Japanese bombing, as already bombs were exploded by Japan in Kumbirgram and Derby of Cachar district. However, Quit India Movement was observed with full vigour in Surma Valley. Madrassa students and Ulema of most of the madrassas actively participated in the movement. They came out wearing ‘kurtas’ (Punjabi) and chanted slogans ‘Allahu Akbar’. ‘Quit India’.

In the last phase of India’s movement for freedom and after the Lahore Resolution of Muslim League for a separate homeland for Muslim of India the socio-religious organization of Muslims of India headed by the *ulemas* devided on the issue of partition. The most prominent organization Jamiat Ulema-e-Hind till the last day of colonial India were against the partition. Most of the madrassas of Surma-Barak Valley were affiliated to Dar-ul-Ulum Deoband and were the followers of Jamiat Ulema-e-Hind. The presence of *Sheikul Islam*, Hussain Ahmed Madani at Naya Sadak Mosque of Sylhet gave a spirit to the ulemas mainly of Qaumi madrassas. Madani persistently appealed to the Muslims to oppose the demand of Pakistan. His appeal was rooted in his insistence that

Islam itself required Muslims to love their motherland.²² However, Maulana Romiz Uddin Ahmed of Sylhet Aleya Madrassa was an active supporter of the Muslim League and also for Pakistan.²³ He patronized, *Al-Islah*, the first monthly journal from Sylhet through which he propagated the ideology of Pakistan. The man who played a vital role in mobilizing the Muslim masses of Sylhet during the referendum was Maulana Suhul Usmani of Sylhet Aleya Madrassa. His speech in the light of *Qur'an* and *Hadith* before the huge gathering of Muslim masses on 12th June 1947 (Thursday) at Shah Jalal Dargah Mosque had a wide religious appeal that to a large extent changed the mood of the common Muslim masses of Surma Valley. His speech was later printed and widely circulated throughout the district as '*fatwa*' and had greatly convinced the Muslim masses to cast their vote in favour of East Pakistan.²⁴ Besides, Fulbari Aziria Madrassa, and Jhingabari Fazil Madrassa played important role in favour of partition. Maulana Abdul Musabbir of Gahapur, Balaganj who studied in Fulbari madrassa formed the Sylhet District Muslim Students Association which voluntarily worked for mobilizing Muslim masses in favour of partition.²⁵ On the other hand, Dar-ul-Hadith Ashraful Ulum Madrassa, Ratanpur, Hailakandi was a Deobandi

Madrassa and ulemas of the madrassa actively supported and followed Jamiat Ulema-e-Hind. Al Jamiatul Arabiatul Islamia, Badarpur, Cheragia Qaumia Madrassa of Karimganj, Markajul Ulum Madrassa of Bhanga, Karimganj, Dar-ul-Ulum, Sahabad, hailakandi, Jamia Islamia Dar-ul-Ulum Dar-ul-Hadith, Kanaighat Madrassa of Sylhet were the centers of Jamiat Ulema-e-Hind. Maulana Muhammad Moshaid Ali was popularly called Bayumpuri after the name of the village Bayumpur. Maulana Ahmed Ali of Banskandi, Cachar, Maulana Abdul Jalil of Badarpur and Maulana Mohammad Mushaid Ali of Sylhet were the devoted disciples of *Sheikul Islam* Hussain Ahmed Madani and they worked hard to mobilize the Muslims masses against the partition scheme of the Muslim League.

Conclusion

The institutions that were founded to impart religious education to its 'community' and 'society' also became an active in mobilizing the Muslim masses of Surma-Barak Valley both socially and politically and took active part in the movement to liberate the country from the foreign yoke considering it as the part of '*Iman*'. The participation of Deobandi ulemas in the freedom movement in Surma-Brak Valley was an integral part

of the participation of Pan-Indian ulemas in general and Deobandi ulemas in particular as most of such ulemas of this region were either product of Deoband Madrassa or of Deobandi Madrassa or were 'murid' of either Hussain Ahmed Madani or Rshid Ahmed Ganguihi, or the same line, 'silsila'. However, in the last phase of the colonial regime, western educated Indian Muslims with their intellect ability succeeded in winning the faith of a good number of traditionally educated Muslim theological persons showing them the dreamland, Pakistan as 'Dar-ul-Islam', and made them the prescriptions of Muslim League's agenda. Most of them were opponents towards Deobandis and Jamiat Ulema-e-Hind due to their ideological differences on different issues and over the holding of chairs and positions. Thus common Muslim masses of Surma Barak Valley who were largely influenced by ulemas were also divided following the ideological footpaths of their spiritual guides.

References

1. Laskar, Mahbubur Rahman, *Madrassas and Partition: A Study of the Madrassas of Surma- Barak Valley and Their Responses to the Partition and Anti-Partition Movement 1940-47*", Unpublished Ph.D. Thesis, Assam University Silchar, 2017, p. 1
2. Ali, Riaz, *Religion and Politics in South Asia*, Routledge, New Jersey, 2008, p. 37
3. Sajjad, Dr. Mohammad, *Resisting Colonialism and Communalism Madrasas of Colonial Bihar*, in 'Madrassa Education in India', Kanishka, New Delhi, 2005, p. 171
4. Ahmed, Manzoor, *Islamic Education: Redefinition of Aims and Methodology* Genuine Pub.Delhi, p. 31,32
5. Tabassum, Farhat, *Deoband Ulema's Movement for Freedom of India*, Manak, New Delhi, 2006, p. 42
6. Sikand, Y., *The Indian State and the Madrassa*, Sep.01, 2001, www.himalmag.com
7. Ahmed, Manzoor *Islamic Education: Redefination of Aims and Methodology* Genuine Pub.Delhi, p. 32
8. Qur'an 39:9
9. Al-Hadith, *Abu Dawood, 3636, Tirimidhi:2682*
10. Alom, Arshad, *Inside a Madrassa: Knowledge, Power and Islamic Identity in India*, Routledge, New Delhi, 2011, p. 45
11. Dutta, Binayak, *Religion in Politics : Eastern India 1905 – 1947*, Pilgrims, Varanashi 2009 p. 50
12. *Tirimidhi*, Adaha:15, *Bukhari*, Adab:108
13. *Laskar, Mahbubur Rahman*, p. 137
14. *Ibid*, p. 138
15. *Ibid*, p. 139
16. Taher, Maulana Mohammad, *Madani Charita*, Mallik Brothers, Calcutta, 1998, p. 8
17. *Ibid*, p. 9
18. Das, Nishit Ranjan, *Swadhinata Sangrame*

- Srihatta-Cachar*, Dinkal Press, Silchar, 2006, p. 74
19. Laskar, Mahbubur Rahman, “Dar-ul-ulum Banskandi: Tracing the History of a Madrasa in Colonial Barak Valley’, unpublished M.Phil Dissertation, Assam University Silchar, 2009, p. 42
 20. Ahmed, Dr. Kamal Uddin, *Karimganjer Itihas*, Natun Diganta Prakshani, Silchar, 2013, p. 236
 21. Mazumder, Habibullah, *Nationalists Vs. Communalists: A Study of Politics of the Muslim in Assam (1920-47)*, Unpublished Ph.D Thesis, Assam University, Silchar, 2007, p. 268
 22. Madani, Maulana Hussain Ahmed, *Hamara Hindustan aur Uske Faza'il*, a Urdu booklet published in 1941, Deoband.
 23. Choudhury, Mustansirur Rahman, *Anchalik Itihas: Fulbari Aziria Aleya Madrasa*, Sylhet, 1999, p. 72
 24. Leaflet containing this *fatwa* in Bengali was published and circulated by Maulana Wasif Ullah, Secretary, District Jamiat Ulema-e-Islam, Shah Abu Turab Masjid Road, Srihatta.
 25. Laskar, Mahbubur Rahman, *Madrassas and Partition: A Study of the Madrassas of Surma- Barak Valley and Their Responses to the Partition and Anti-Partition Movement 1940-47*”, Unpublished Ph.D. Thesis, Assam University Silchar, 2017, p. 203-205

BL College Journal Vol-III, Issue-II, December 2021 Subscription : BDT 300/- [\$ 5 Outside Bangladesh]



Published by
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh